দ্বিরাগমন

সুবোধ ঘোষ

DIRAGAMAN

By Subodh Ghose

□ প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৬৯

□ প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

□ প্রচ্ছদ ঃ বিমল দাস

দ্বিরাগমন

পরেশ রায় কেমন ছেলে ?

প্রশ্নটা এ-শহরের যাকেই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, প্রত্যেকেই বলবে, ঐ একরকমের ছেলে ; ভাল নয় মন্দও নয় ; সামান্য সাধারণ রকমের ছেলে।

কিন্তু পরেশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাস্করকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, তবে বেশ অপ্রসন্নভাবে আর বেশ রুক্ষ স্বরেই বলে দেবে ভাস্কর— নিতান্ত বাজে স্বভাবের ছেলে।

কেন ?

ট্রেচারাস বলে পরেশের একটা সুনাম অবশ্য আছে ; কিন্তু এক ফোঁটা সৎসাহস সেই। বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ববোধ নেই।

ভাস্করের মন্তব্যটা ভাষার হেঁয়ালির মত মনে হবে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, ভাস্কর তার ধারণার কথাটাই অকপটভাবে ব্যক্ত করেছে। ভাস্করের বোধহয় নিজেরই ধারণার সত্য-মিথ্যা দিয়ে তৈরী একটা জগৎ আছে। সে জগতে পরেশ সত্যিই ট্রেচারাস ; পরেশের কোন সৎসাহস সেই। পরেশের মনুষ্যত্ববোধ বলতেও কিছু নেই।

পরেশ একবার ভাস্করের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কোনদিন সনাতন-বাবুকে আর কোনরকমের সাহায্য করবে না। যদি চার আনা পয়সাও ধার চান সনাতনবাবু, তবু পরেশ সোজা বলে দেবে, না, হবে না।

নাতনবাবুকে সাহায্য করা মানে, সনাতনবাবুর সেই বিশ্রী স্বভাবের মেয়েটাকে সাহায্য করা। কারণ, সনাতনবাবু লোকটা মানুষের াছে হাত পেতে পেতে দু'চার টাকা যা রোজগার করে, সেটা নাতনবাবুর মেয়েরই যত শখের দরকারে খরচ হয়ে যায়। ভাল াড়ি ; ভাল পাউডার আর সেন্ট ; আর ভাল সুর্মা। মেয়েটা কেন য এত সাজে, সেটা আর সন্দেহ করে বুঝতে হয় না ; বোঝাই

যায়। ত্রিশ টাকার কেরানীগিরি করে যে-সনাতনবাবুর দু'বেলার পুরো ভাতও হয় না, সে সনাতনবাবুর মেয়ের এধরনের রূপসী সাজবার শখ যে একটা বাজে স্বভাবের শখ, সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই। প্রমাণ আরও আছে। শুধু ভাস্কর নয়, পরেশ নিজেও কতবার দেখেছে, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের একটা ছেলের সঙ্গে, তারমানে নীহারের সঙ্গে, কথা বলছে সনাতনবাবুর মেয়ে বসুধা। নীহার বয়সে অবিশ্যি নিতান্ত ছেলেটা নয়; পরেশ আর ভাস্করেরই সমান। পার্থক্য শুধু এই যে, নীহার বেশ স্টাইল করে সাজে; মুখে স্নো মাখে, আর বেশ চমৎকার গান গায়। আর পরেশ যদিও স্নো মাখে না, কিন্তু তবু নীহারের চেয়ে দেখতে অনেক ভাল। নীহার অবশ্য বড়লোকের ছেলে; আর পরেশ নিতান্ত কেরানী. মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

সনাতনবাবুর যেদিন জলবসন্ত হয়েছে বলে খবর পেল পরেশ, সেদিন পরেশ সত্যিই যেন আনমনার মত সনাতনবাবুর বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আর কি? ভাস্করের কাছে বলা প্রতিশ্রুতির কথাটা বোধহয় একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। সনাতনবাবু যা যা বললেন, সবই কিনে এনে দিল পরেশ। দশ সের চাল, দু'সের ডাল, এক সের সরষের তেল। কিছু মিছরি, দুটো কাপড়-কাচা সাবান···আর, হ্যাঁ, বসুধার জন্য একটা সুগন্ধ মাথার তেল আর একটা গায়ে-মাখা সাবান। সবসুদ্ধ প্রায় এগার টাকার জিনিস কিনে আর সনাতনবাবুর ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে এসেছিল পরেশ।

ভাস্কর বলছিল—তুমি আমার সঙ্গে এরকম ট্রেচারি করলে কেন?

পরেশ হাসে—যখন করেই ফেলেছি, তখন আর মিছিমিছি কেন রাগারাগি করছো? যেতে দাও ওসব কথা।

ভাস্কর—কত টাকা চুলোয় গেল?

পরেশ—এগার টাকা।

ভাস্কর—ছি, ছি।

এটাই হলো সেই ঘটনা, যে ঘটনার জন্য পরেশের সম্পর্কে ভাস্করের মনে একটা ধারণা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পরেশ সত্যিই একটু ট্রেচারাস।

ঠিক কথা; এধরনের আরও কয়েকটা ঘটনা হয়েছে, যাতে দেখা গেছে যে, ভাস্করের কাছে মুখে এক কথা বলে কাজের বেলায় ঠিক উল্টোটি করে বসে আছে পরেশ। দেখে আশ্চর্য হয়েছে ভাস্কর; পরেশের হাসিমুখের প্রতিশ্রুতির ভাষা যেন একটা কপটতার কৌতুক; ওর ইচ্ছার আসল ভাষাটা যেন একেবারে বুকের ভিতরে লুকানো একটা সাংঘাতিক চালাক আর ভয়ানক নীরব একটা প্রতিজ্ঞা।

ভাস্করকে কথা দিয়েছিল পরেশ, সেই মামলাটাতে সাক্ষী হয়ে দুটো কথা একটু ইয়ে করে অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু মিথ্যের মত করে হাকিমের সামনে বলে দিতে পারবে। তা হলে ভাস্করের মক্কেলের একটু সুবিধে হয়। ভাস্করের মক্কেল সেজন্য পরেশের হাতে দুটো দশ টাকার নোট গুঁজে দিতেও রাজি ছিল। পরেশ বলেছিল, না না, একটা সামান্য কাজের জন্যে বেচারা কেন মিছিমিছি এতগুলো টাকা খরচ করবে? আমি এমনিতেই···।

কিন্তু সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে-কথা বলেছিল পরেশ, সে কথার একমাত্র এই মানেই হয় যে, একটা মিথ্যে কথা বলতে চেষ্টা করেও বলতে পারবে না, বলতে চাইছেও না পরেশ। হাকিম হেসে ফেলেছিলেন। ভাস্কর বলেছিল—ছিঃ, তোমার এই সামান্য মর‍্যাল কারেজ, সামান্য সৎসাহসটুকুও হলো না পরেশ?

কিন্তু ভাস্করের মক্কেলের বিপক্ষ পার্টি খুব খুশি হয়ে পরেশের সুনাম গেয়ে বেড়িয়েছিল। সেই ব্যাপার দেখেই আশ্চর্য হয়েছিল ভাস্কর।

—বাঃ, তোমার ট্রেচারির তো বেশ একটা সুনাম হয়েছে দেখছি।

এ শহরে ইন্দুবাবুর চেয়ে বেশি সম্মানের মানুষ আর কেউ নেই। যেমন ঐশ্বর্য আছে, তেমনই চালচলনের আভিজাত্যও আছে। খুব শৌখীন বড়লোকও বোধহয় চারবেলায় চারবার সাজ বদলায় না।

কিন্তু ইন্দুবাবু সারাদিনের চার বেলায় চারবার গাড়ি বদলান। এহেন ইন্দুবাবুর ছেলের বউভাতে শহরের সব বাঙালীর আর প্রায় সব বড়লোক অবাঙালীর নেমন্তন্ন হয়েছিল। বাদ পড়েছিল শুধু একজন বাঙালী, ঐ সনাতনবাবু। কেমন করে এমন একটা বাদ সম্ভব হলো, সেটা অনেক ভেবেও বুঝতে পারেনি পরেশ। ভাস্কর বলেছিল, খুব ভালো হলো ; এরকমের হওয়াই উচিত।

কিন্তু ইন্দুবাবুর ছেলের বউভাতে নেমন্তন্ন খেতে যায়নি পরেশ। আশ্চর্য হয় ভাস্কর, তুমি ইন্দুবাবুর বাড়ির নেমন্তন্নে গেলে না কেন হে পরেশ ?

ইচ্ছে হলো না।

কেন ?

শুনলাম, ইন্দুবাবু কোন কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে নিজে গিয়ে নিজের মুখে নেমন্তন্ন করেছেন।

হ্যাঁ।

কিন্তু আমার বাড়িতে যান নি।

নেমন্তন্ন করেন নি ?

করেছেন ; ইন্দুবাবুর চাকর এসে নেমন্তন্নের একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল।

এই জন্যে তুমি নেমন্তন্নে গেলে না ?

হ্যাঁ।

ছিঃ, তোমার একটু মনুষ্যত্ববোধ থাকলে একথা বলতে না, একাজ করতেও না। আমাকেও তো ইন্দুবাবু নিজে নেমন্তন্ন করতে আসেননি, চাকর এসে নেমন্তন্নের চিঠি দিয়ে গিয়েছে। তাতে হয়েছে কি ?

ভাস্করের বক্তব্য শুনে নিয়ে আর কোন কথা না বলেই চলে যেতে থাকে পরেশ। কিন্তু ভাস্কর হঠাৎ কিসের যেন একটা সন্দেহে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে— আমার কি মনে হচ্ছে জান ?

কি ?

তুমি বোধহয় সনাতনবাবুর সঙ্গে একটা সিমপ্যাথির হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করে ···।

হেসে ফেলে পরেশ—হতে পারে।

চেঁচিয়ে ওঠে ভাস্কর—হতে পারে ?

হ্যাঁ।

ভাস্কর—ছি ছি, সনাতনবাবুর মত একটা বাজে লোককে ঘেন্না করতে পারলে না, তোমার একটা সামান্য মানসিক উদারতাও নেই দেখছি।

পরেশ কোন কথা না বলেই আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

দুই

সনাতনবাবু বলেন—তুমি কেন ইন্দুবাবুর বাড়ির নেমন্তন্নে গেলে না পরেশ ! তোমার তো নেমন্তন্ন হয়েছিল।

ঘরের খোলা দরজাটার পাশে কে যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটার উত্তর শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। তারই শাড়ির আঁচলটা মাঝে মাঝে ফুরফুর করে উড়ে ধরা পড়িয়ে দিচ্ছে যে, একজন এখানে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরেশ বলে—আপনাদের নেমন্তন্ন হয়নি বলে আমার ভাল লাগলো না।

সনাতনবাবু অনেক কথা বলবার পর শেষে একটি কথা বললেন—কি যে দোষ করলাম আর কোথায় যে কি ভুল হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না পরেশ।

পরেশের গম্ভীর চোখ দুটোও যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বোধ হয় বলতে চায় পরেশ—দোষ হলো, ঐ একমাত্র দোষ, ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানী হওয়া। আর ভুল হলো, ঐ একমাত্র ভুল, আপনার মেয়েটার মুখটা এত সুন্দর হওয়া।

কিন্তু বলতে ইচ্ছে করলেও কথাটা যেন গলার কাছে আটকে থাকে। বলে আর লাভ কি ? ভাগ্য যাকে এত ধিক্কার দিয়েছে আর

দিয়েই চলেছে, তাকে নতুন একটা ধিক্কার না দিলেও চলবে।
সনাতনবাবু বলতে বলতে শেষে হেসেই ফেল্লেন ইন্দুবাবুর মত রাজা মানুষও আমার মত একটা ভিখিরী মানুষের উপর রাগ করতে পারে. আমি এতটা অবিশ্যি ভাবতে পারিনি পরেশ।
কেন রাগ করেছেন ইন্দুবাবু?
কেন করেছেন, সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু দেখতেই তো পেলে. সারা শহরের মধ্যে একমাত্র আমাকেই নেমন্তন্ন থেকে বাদ দিলেন।
হ্যাঁ, আমিও সে-কথাই ভাবছিলাম। কেন? এরকমের ব্যাপার কেন হলো?
ইন্দুবাবু অবিশ্যি আমার একটা উপকার করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি···।
উপকার?
হ্যাঁ। আমার বসুধা তো লেখাপড়া জানে না। অথচ কাজ করতে চায়। তাই ইন্দুবাবুর পুত্রবধূর কাছে গিয়ে একটা কাজ চেয়েছিল। ইন্দুবাবুর বাচ্চা নাতিটার নার্স হয়ে কাজ করতে চেয়েছিল বসুধা, যদি অন্তত কুড়িটা টাকা মাইনে দেয়।
তারপর কি হলো?
ইন্দুবাবুও বসুধাকে ডেকে আর খুব মায়া করে বললেন, কাজটাজ করতে হবে না; তুমি মাঝে-মাঝে একটু চুপি চুপি এসে টাকা নিয়ে যেও।
চুপি চুপি কেন?
ইন্দুবাবু বলেছেন, তিনি মানুষের উপকার একটু চুপি চুপি করতেই ভালবাসেন।
আপনি রাজি না হয়ে ভালই করেছেন।
আমি রাজি হয়েছিলাম পরেশ; কিন্তু মেয়েটাই রাজি হলো না।
ভালই হলো।
কি করে যে ভাল হলো, তাও যে বুঝতে পারছি না।

কেন ?

ওর গতি কি হবে ?

কার ?

আমার বসুধার।

কি হয়েছে বসুধার ?

বেশ অপমান হয়েছে।

তার মানে ?

নীহার ওকে বিয়ে করবে না।

নীহার কি বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল ?

তা জানি না। কিন্তু বসুধার বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে, নীহার ওকে বিয়ে করবে।

কেন এমন বিশ্বাস হলো ?

বসুধাই জানে। আজ বলছে, নীহারের ভয়ে ওর ঘুমই হচ্ছে না। বলছে, আমাকে এখনি কোথাও পাঠিয়ে দাও।

নীহার এদিকে আসে ?

আজকাল আর আসে না।

ওকে ভয় কিসের ?

কে জানে ; কিসের ভয় ?

আপনি তো নীহারকে একবার জিজ্ঞেস করলে পারেন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম।

কি বলে নীহার ?

নীহার তো মুখে ভাল কথাই বললে।

কি ?

নীহার বললে, আমি তো কোনদিন আপনার মেয়েকে ওসব কোন কথা বলিনি। তবে···হ্যাঁ···বসুধা যদি চায় তবে আমি ভেবে দেখতে পারি।

তাহলে তো বসুধারই ভুল হয়েছে।

আমারও তাই মনে হয়। নীহারের মত ভাল ছেলে যে কোন

রকমের ইচ্ছে নিয়ে বসুর সঙ্গে গল্প করেছে, সেটা আমারও মনে হয় না।

তবে কেন গল্প করতে আসতো নীহার ?

সত্যি কথা হলো, নীহার আসতো না। বসু নিজেই ওকে ডাকতো, তাই আসতো।

কেন ডাকতো ?

নীহারের বোন মালতীর সঙ্গে বসুর একটু ভাব-সাব ছিল, মালতীর অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে।

কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না !

মালতীর খবর-টবর জানবার জন্যেই নীহারকে ডেকে কথা বলেছে বসু, আমার তো এই মনে হয় !

কিন্তু আমার তা মনে হয় না।

যে ঘরে বসে সনাতনবাবুর সঙ্গে কথা বলছে পরেশ, হঠাৎ সে-ঘরের শান্ত বাতাস যেন চমকে ওঠে। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বসুধা।

সোজা পরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে, আর চোখের দৃষ্টিটাকে যেন রুষ্ট আগুনের শিখার মত জ্বালিয়ে দিয়ে কথা বলে বসুধা—আপনার কি মনে হয় ?

চমকে ওঠে পরেশ। সনাতনবাবু আতঙ্কের মত চেঁচিয়ে ওঠেন—ছি ছি, এখানে এসে তুই এ কি-রকম অভদ্রভাবে কথা বলছিস ? ভেতরে যা ; যা যা যা !

বসুধা বলে—ভাল ছেলে নীহার। চমৎকার ছেলে। খুব দয়ালু ছেলে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সনাতনবাবুর মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার খুবই লজ্জা হয়। সে চায় ঘরের ভিতরে এসে চুপি চুপি গল্প করে···

সনাতনবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—যা যা যা !

চলে যায় বসুধা। আর একেবারে গম্ভীর হয়ে পরেশও যেন একটা বিস্ময়ের জ্বালা চুপ করে সহ্য করতে চেষ্টা করে।

সনাতনবাবু বলেন—তুমি কিছু মনে করো না পরেশ। ছি ছি, আমিও ভাবতে পারিনি যে, তোমাকে এভাবে ধমক দিয়ে অভদ্র-ভাবে কথা বলতে পারে বসুধা। লেখা-পড়া শেখেনি ; মায়ের স্নেহ পায়নি ; মা মরেছে সেই কবে, ওর বয়স যখন তিন বছর, আর, বাপ তো দু'বেলা পেট-ভরে ভাত খাওয়াতে পারে না ; এমন মেয়ের স্বভাব যে একটা রাগী সাপের স্বভাবের মত হয়ে যাবে, এটা স্বাভাবিক।

পরেশ বলে—না, আমি কিছু মনে করিনি।

সনাতনবাবু - মেয়েটাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে একটা চেষ্টাও করেছিলাম। তোমারই বন্ধু ভাস্করের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম।

ভাস্কর সাহায্য দিল না ?

দিতে চেয়েছিল। কিন্তু···।

কি ?

বসুধা বেঁকে বসলো।

কেন ?

সেটা তো আমি ঠিক বলতে পারছি না। কে জানে কি ভেবে···।

আবার ঘরের দরজার কাছে একটা ক্ষুব্ধ বিরক্ত আর রুক্ষ, অথচ বেশ সুন্দর করে সাজানো একটা রূপের মূর্তি যেন একটা হঠাৎ আক্রোশের মত ছুটে এসে ছটফটিয়ে ওঠে—আমি বলতে পারি। আপনার বন্ধু ভাস্কর আমাকে বলেছিলেন, তাঁর সাহায্যের কথা যেন আমি কাউকে না বলি। উনি চুপি চুপি এসে আমাকে টাকা দিয়ে যাবেন, আর আমি চুপি চুপি টাকা নেব।

যা যা যা, ভেতরে যা। চেঁচিয়ে ওঠেন সনাতনবাবু।

আবার চলে যায় বসুধা।

পরেশ বলে—আপনার মেয়েকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন।

সনাতনবাবু—আমিও তাই ভাবছি। একটা জায়গা অবিশ্যি আছে।

পরেশ—কোথায় ?

সনাতনবাবু—কলকাতাতে। সুলতার কাছে।

সুলতা কে ?

বসুরই এক মাসতুতো দিদি। সুলতাকে লিখেছিলাম। সুলতা খুব খুশি হয়ে লিখেছে, শিগগির পাঠিয়ে দিন : এখানে সুখেই থাকবে বসু, ওর সব ভার আমিই নিলাম।

তবে আর দেরি করছেন কেন ? পাঠিয়ে দিন।

কিন্তু পাঠাই কি করে ? কিছু টাকা না হলে যে ··

কত টাকা দরকার ?

অন্তত কুড়ি টাকা।

নিন। আমি দিচ্ছি।

দরজার কাছে আবার সেই মূর্তি, যার নাম বসুধা। সনাতনবাবুর মেয়ে, দু'বেলা পেট ভরে ভাত খায় না, অথচ সুন্দর হয়ে সাজে বেশ বয়সও হয়েছে। পঁচিশের কম তো নয়। গলায় একটা দার্জিলিং পাথরের মালা দুলছে, ছোট ছোট বরফকুচির মত নকল পাথরের টুকরো দিয়ে গাঁথা ঝকঝকে একটা মালা।

দেখে মনে হয়, যেন একগাছা হীরের কুচি বুকের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে বসুধা। মুখেও লালচে একটা ক্রীম মেখেছে। তা না হলে ভোরের আকাশের রক্তরাগের মত এরকম একটা লালচে আভা এই মেয়ের সাদা মুখে ফুটে উঠবে কেন ?

চোখে আর সেই কটমটে জ্বালা নেই। যে-ঠোঁটে শক্ত করে দাঁত চেপে ধরেছিল, সে-ঠোঁট কত নরম হয়ে গিয়েছে, চমৎকার স্নিগ্ধ একটা হাসিও যেন ঝরে পড়তে চাইছে।

পরেশেরই মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে বসুধা—ধন্যবাদ, খুব উপকার করলেন। আপনিও চুপি চুপি উপকার করতে পারেন !

তার পরেই যেন একটা ছটফটে উল্লাসের মত ঘরের ভিতরে চলে যায় বসুধা।

সনাতনবাবু বলেন—তুমি বসুধার কথা কানে নিও না পরেশ ! ও মেয়ে যেমন অভদ্র, তেমনই মুখরা ; তেমনই···।

তিন

এ শহরের প্রায় সকলেই, অন্তত সব বাঙালীই জানে, আজ তিন বছর হলো কোথায় চলে গিয়েছেন সনাতনবাবু, সেই ভয়ানক বিষণ্ণ আর রোগা চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যিনি এক-এক সময় যার তার কাছে সাহায্যের জন্য হাত পেতে ফেলতেন, আর ত্রিশ টাকা মাইনের একটা কেরানীগিরি করতেন।

ভবপারে চলে গিয়েছেন; তিনবছর হলো মারা গিয়েছেন সনাতনবাবু। কিন্তু কেউ জানে না, কেউ বলতেও পারবে না, মারা যাবার দুটো মাস আগে মেয়েটাকে কোথায় পার করে দিয়ে এলেন সনাতনবাবু। ভাস্কর, লোকের হাঁড়ির খবর রাখা যার অভ্যাস, সেও জানে না। আর, সবচেয়ে আশ্চর্য, সনাতনবাবুর বাড়িতে প্রায়ই যেত যে ছোকরা, সেই পরেশও যে-টুকু জানে, সেটা না জানারই মতো। অনেক দূর-সম্পর্কের এক দিদি হয়, তারই কাছে কলকাতাতে চলে গিয়েছে সনাতনবাবুর মেয়ে, পরেশের কাছ থেকে একথা শুনতে পেয়ে ভাস্করই চোখ পাকিয়ে বলে ফেলেছিল—তার মানে বেরিয়ে গেছে।

বোধ হয় দেখতে পায়নি ভাস্কর, অমন নিরীহ ও শান্ত পরেশের চোখ দুটো কী-ভয়ানক দপ্ করে জ্বলে উঠলো। পরেশ বলে—তুমি খুবই ভুল সন্দেহ করে ভয়ানক বাজে কথা বলছো ভাস্কর।

ভাস্করও আশ্চর্য হয়, এরকম উত্তপ্ত স্বরে কোনদিন কথা বলেনি পরেশ। জোর করে কোন কথা বলা যে পরেশের অভ্যাসই নয়। শুধু ওর কথাগুলি কেন, ওর প্রাণটাও যে জোর করতে পারে না। পাশ কাটিয়ে সরে পড়াই ওর ভাগ্যটার নিয়ম।

ভাস্কর বলে আমি জোর করেই বলছি, সনাতনবাবুর মেয়েটা বেরিয়ে গেছে। বাপটা বাধ্য হয়ে শুধু পৌঁছে দিয়ে এসেছে। সামান্য বুদ্ধি থাকলে তুমিও এটুকু বুঝতে পারতে।

পরেশের দপ্ করে জ্বলে ওঠা চোখ যেন হঠাৎ নিভু-নিভু হয়ে যায়।

যেন দুঃসহ একটা যন্ত্রণা এসে চোখ দুটোকে কুঁচকে দিয়েছে।

যাই হোক্‌…। কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে ভাস্কর। তারপর অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে।—তুমি তো এবার একটা বিয়ে করলে পার পরেশ।

পরেশ—কেন?

ভাস্কর—মাইনে তো বেড়েছে।

তা কিছু বেড়েছে ঠিকই।

কত?

দশ টাকা।

মাত্র?

আরও ত্রিশ টাকা বাড়বে, যদি কলকাতায় গিয়ে তিনটে মাস থেকে একটা পরীক্ষা দিয়ে আর পাশ করে আসতে পারি।

পরীক্ষা দাও তবে।

দেব।

কবে দিতে চাও?

ভাবছি…এ মাসেই যদি…।

ভাববার কি আছে?

ভাবছি, কলকাতায় তিনটে মাস থাকার মত টাকা যোগাড় করে নিয়ে তারপর…।

ভাস্কর যেন হঠাৎ উৎসাহিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে।—চান্স চান্স, প্রতিশোধ নেবার একটা চান্স পাওয়া গেল পরেশ।

পরেশ—কিসের চান্স? কিসের প্রতিশোধ?

ভাস্কর—আমার এক মাসতুতো দাদার খুড়তুতো ভাই পূর্ণবাবু কলকাতাতে থাকেন। ভদ্রলোক আমাকে প্রায়ই জ্বালিয়ে থাকেন। বছরে অন্তত তিন-চারবার তাঁর কাছ থেকে এক-একটি লোক এসে আমার এখানে পাঁচ-সাত দিন থাকে, রাক্ষসের মত খায় আর চলে যায়। মাসতুতো দাদা খুব বড়লোক মানুষ; তিনিও পূর্ণবাবুর কথায় আমাকে অনুরোধ করে চিঠি দেন বলে, অর্থাৎ একটা চক্ষু-

লজ্জার জন্য আপত্তি করতে পারি না। কাজেই···আমি বলি, তুমিও আমার চিঠি নিয়ে পূর্ণবাবুর বাড়িতে গিয়ে তিন মাসের মত গেস্ট হয়ে আর গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। খাও দাও, আর নিজের কাজ গুছিয়ে চলে এস।

পরেশ হাসে—পূর্ণবাবু যদি অখুশি হন, তবে কিন্তু···।

ভাস্করও হাসে—ওদেরও তো একটা চক্ষুলজ্জা আছে। অখুশি হলেও তোমাকে থাকতে দিতে বাধ্য হবে।

পরেশ—তবু···।

ভাস্কর—না, তুমি আপত্তি করো না পরেশ। যদি ওরা অভদ্র ব্যবহার করে, তবুও বেপরোয়া হয়ে সব সহ্য করবে, তা না হলে ওরা জব্দ হবে না।

চুপ করে কি-যেন ভাবে পরেশ। তার পরেই বলে—আচ্ছা, দাও তবে একটা চিঠি।

ভাস্কর—দিচ্ছি, কিন্তু মনে রেখ পরেশ; পূর্ণবাবু লোকটাকে একটু জব্দ করা চাই···আর...আর একটা কাজ যদি করে আসতে পার···।

পরেশ—বল।

ভাস্কর—নিজের জন্যে না পার অন্তত আমার জন্যে একটি মেয়ের খোঁজ নিয়ে যদি আসতে পার, তবে...।

পরেশ খুশি হয়ে হাসে। এই তো, এতক্ষণে একটা ভাল কাজের কথা বললে। বল তাহলে···কিরকম মেয়ে খুঁজবো?

ভাস্কর বলে—সত্যি কথাটা তাহলে বলেই ফেলি।

পরেশ—বল।

ভাস্কর—চেহারাটা যদি সেই সনাতনবাবুর মেয়েটার মত হয়, তবে মন্দ হয় না পরেশ।

চমকে ওঠে পরেশ। ভাস্কর বলে—কিন্তু মেয়ের স্বভাবটা যেন ওরকমের বাজে স্বভাব না হয়। খুব ভাল করে খোঁজ নেবে।

চার

বাগবাজারের এক গলিতে পূর্ণবাবুর বাড়ি। একটি ছোটখাট দোতলা বাড়ি। নীচের তলায় একটা মাত্র থাকবার ঘর। উপর তলায় তিনটে। নীচের তলায় থাকবার ঘরের পাশেই ঘুঁটে আর কয়লার ঘর। একটা কাঁকড়া বিছে অসাড় হয়ে ঘরের মেঝের ওপর পড়ে আছে ; তাও দেখতে পাওয়া যায়।

চিঠিটা পড়ে নিয়ে পূর্ণবাবু ভ্রূকুটি করে পরেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ; তার পরেই কাঁকড়া বিছেটার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—বেশ এখানেই তাহলে থাক। আমার আপত্তি নেই।

পরেশ বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার শুধু একটা জায়গা দরকার।

পূর্ণবাবু—আমিও তো তাই বলছি, শুধু একটা জায়গায়ই দিতে পারি ; খাওয়া-দাওয়ার জন্য অন্যত্র ব্যবস্থা করে নাও।

পরেশ—তা তো করে নিতেই হবে।

পূর্ণবাবু—করে নাও। আমরা অসুস্থ স্বামী-স্ত্রী কোন মতে টিঁকে আছি। তোমার খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেবার সামর্থ্য আমাদের নেই।

পরেশ বলে—কোন দরকারও নেই।

পূর্ণবাবু দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন—ওরে ও বসুধা, ইদিকে একবার আয় দেখি ; এঘরের কাঁকড়া বিছেটাকে ঝেঁটিয়ে বার করে দে। ভদ্রলোকের ছেলেকে ক'টা দিন থাকতে হবে তো।

পূর্ণবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে পরেশের অপলক চোখ দুটো যেন দুঃসহ একটা কল্পনার জ্বালা সহ্য করতে থাকে। পৃথিবীতে বোধ হয় অনেক বসুধা আছে। শুধু সনাতনবাবুর মেয়েই একমাত্র বসুধা হবে কেন? নিশ্চয় আরও বসুধা আছে। এ এক অন্য বসুধা।

পূর্ণবাবু বলেন—আমার কি কম অশান্তি হে! এও এক সাংঘাতিক

গলগ্রহ ; কোথাকার এক কুটুম্বের মেয়ে এসে জুটেছে। বাপ তো চালাক, মরে বেঁচেছে। এখনও আমি শালা জ্বলে মরি।

ঘরের মেঝেটার দিকে আনমনার মত তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পরেশ।

পূর্ণবাবু, আচ্ছা চলি আমি। আমার এখন জপ সারতে হবে। তুমি বাপু ঘরের ঐ দিকে ঠাঁই নিও ; বিছানাটা গুটিয়ে রেখ। সারা ঘর দখল করে বসো না। আমার গরুটা এ'কদিন এ-ঘরেই থাকবে।

চলে যান পূর্ণবাবু। আর সেই মুহূর্তে যে-মেয়ে এসে পরেশের চোখের সামনে দাঁড়ায়, সে-মেয়ে সত্যিই যে পৃথিবীর সেই মেয়ে···সেই একমাত্র বসুধা।

কিন্তু এই বসুধার গলায় দার্জিলিং পাথরের কোন মালা ঝিকমিক করে দোলে না। তবু চিনতে কোন অসুবিধে নেই। সেই চোখ, সেই ঠোঁট ; আর সেই চমৎকার ভ্রূকুটি।

বসুধা বলে—আপনি কি ক'রে এখানে এলেন ?

পরেশ—আশ্চর্য !

বসুধা – কেন ?

পরেশ – তোমাকে এখানে দেখতে পাব, এরকম আশা যে স্বপ্নেও··· ।

বসুধা যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করছে। আর হাসিটাও একটা করুণ ঠাট্টার হাসি।—আশ্চর্য ! আশা করেছেন ?

পরেশ—তুমি দেখছি বিশ্বাস করতে পারছো না।

বসুধা —কেমন করে বিশ্বাস করবো বলুন ?

কেন বিশ্বাস করবে না ?

সেদিন যাকে বেহায়ার মত এত স্পষ্ট করে আমার আশার কথা বলেছিলাম, সে তো কুড়ি টাকা খরচ করে আমাকে সরিয়ে দিল। আমাকে তো সে আশা করেনি !

তুমি তো নীহারকে··· ।

চুপ কর। তোমার চোখ ছিল না।

নীহার তো তোমাকে বিয়ে করতে আপত্তি করেনি।

আমার আপত্তি ছিল।

কেন ?

আজও বুঝতে পারনি দেখছি। যাক্ গে। তুমি এখানে থেক না। চলে যাও।

পরেশ—চলে যাব ঠিকই। কিন্তু তোমাকেও যেতে হবে।

না।

কেন ?

আমাকে দয়া করতে হবে না। কুটুমবাড়িতে দাসীর কাজ করছি ; ভালই আছি। কিন্তু তোমার দয়ার কাছে যাব না।

বসুধা !

না ; আজ আর ওভাবে কথা বলো না। আমি বিশ্বাস করতে পারবো না !

বিশ্বাস কর।

কেঁদে ফেলে বসুধা।—না। তুমি তোমার বন্ধু ভাস্করের চেয়েও নিষ্ঠুর। একটুও ভাবলে না, একটুও মায়া হলো না, চুপে চুপে আমাকে সরিয়ে দিলে। বেশ করেছিলে ! আমিও চুপে চুপে মরে যেতে চাই।

বিশ্বাস কর বসুধা, আমি তোমাকে ভুলি নি। আমি তোমাকে ··।

হেসে ফেলে বসুধা—হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, তুমি আমাকে চুপি চুপি ভালবেসেছো ! কিন্তু আমি কেন চুপি চুপি ভালবাসাকে বিশ্বাস করবো ? কোন দরকার নেই। চুপি চুপি ভালবাসার মত মিথ্যে আর কিছু নেই। যে সত্যি ভালবাসে সে চুপি চুপি ভালবাসে না।

পরেশ—না, আর চুপি চুপি নয়। আমি এখনই পূর্ণবাবুকে বলবো।

কি বলবে ?

তোমাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন।

চমকে ওঠে, দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে বসুধা।

পূর্ণবাবু দরজার বাইরে থেকেই ঘড়ঘড় করে কথা বলেন—তবে তাই হোক। সুলতাও বললে, তোমার সঙ্গে নাকি বসুধার আগেই চেনা-

শোনা ছিল।

পরেশ বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পূর্ণবাবু হাঁপ ছাড়েন—আমাকে বাঁচালে হে পরেশ। যাই হোক, বিয়ের জন্যে খরচটরচ করা কিন্তু আমার চলবে না।

পরেশ—আপনি খরচ করবেন কেন?

পূর্ণবাবু—তুমিই তাহলে সব খরচ দেবে?

হ্যাঁ।

টাকা আছে?

আছে।

কত টাকা?

দেড়-শো টাকা।

হ্যাঁ, তাতেই হয়ে যাবে।

পাঁচ

খবরটা শুনে খুব অপ্রসন্ন হয়ে যায় ভাস্কর। মুহুরী মহীতোষ বলেছে, আজ সকালে কলকাতা থেকে সস্ত্রীক ফিরেছেন পরেশবাবু।

সস্ত্রীক?

হ্যাঁ, কলকাতাতেই বিয়েটা হয়েছে।

তিন মাস থাকবে কলকাতায়, পূর্ণবাবুর বাড়িতে থেকে পূর্ণবাবুকে জব্দ করবে। আর ভাস্করের জন্য একটি মেয়ের খোঁজ নিয়ে আসবে, যে মেয়ের মুখটা ঠিক সেই সনাতনবাবুর মেয়ে বসুধার মুখটার মত অদ্ভুত রকমের সুন্দর; এতগুলি প্রতিশ্রুতি পালন করবার দায়িত্ব নিয়ে আর কথা দিয়ে কলকাতায় চলে গেল যে পরেশ, সে সাত দিনের মধ্যে কলকাতা থেকে একেবারে সস্ত্রীক ফিরে এল?

বাঃ, ভাস্করের বুকের ভিতরে যেন বিশ্রী রকমের জ্বালা ছড়িয়ে একটা অস্বস্তি উৎপাত করে বেড়াতে থাকে। একটা সন্দেহও যেন ধিকধিক করে জ্বলে। দেখতে ঠিক বসুধারই মত চমৎকার সুন্দর; এরকম

একটা মেয়ের খোঁজ পেয়ে কি পরেশ শেষে নিজেই লোভ সামলাতে না পেরে···অসম্ভব। এতটা সন্দেহ করবার কোন মানে হয় না। কিন্তু এভাবে সস্ত্রীক চলে আসবার মানেই বা কি ? এসেছে তো আজই সকালে। এখন প্রায় সন্ধ্যা ; এতক্ষণের মধ্যে এখানে এসে একটা খবরও দিয়ে যেতে পারলো না পরেশ। বিয়ে করে কি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল ?

কিন্তু ভাস্করের মাথার ভিতরে যেন একটা জ্বালা ছটফটিয়ে কথা বলতে থাকে—নিজে গিয়ে স্বচক্ষে একবার দেখে এলেই তো হয়। গ্যারেজ থেকে গাড়িটাকেও যেন একটা আক্রোশের আবেগে স্টার্ট দিয়ে বের করে ফেলে ভাস্কর। তারপরেই সোজা পরেশের বাড়ি। কারবালা রোডের শেষে একটা গলির মুখে পরেশের যে বাড়িটার দরজা আজ এই সন্ধ্যাতে একেবারে খোলামেলা হয়ে আর আলো জ্বালিয়ে হাসছে, সেই বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে ভাস্কর—পরেশ।

পরেশ এসেই হাসতে থাকে।—এই যে, তুমি এসেছো। খবর পেয়েছো বোধহয়।

ভাস্কর—হ্যাঁ, কিন্তু খবরটা কি ?

পরেশ—বিয়ে করে ফেললাম।

ভাস্কর হাসতে চেষ্টা করে।—কিন্তু এত হঠাৎ একটা বিয়ে ?

পরেশ—হঠাৎই হয়ে গেল।

পরেশের বাড়ির ভিতরের ঘরে রঙীন শাড়ি দিয়ে সাজানো যে মূর্তিটা অদ্ভুত একজোড়া নিবিড় হাসির চোখ নিয়ে চা তৈরী করছে, তারই দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হেসে ফেলে ভাস্কর। চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলে।—মনে হচ্ছে, সেই বসুধারই মত সুন্দর একটা মেয়ের খোঁজ পেয়ে আর তাকে বিয়ে করে তুমি···।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পরেশ—সেই বসুধার মত নয়, সেই বসুধাকেই বিয়ে করেছি।

কি বললে।

হ্যাঁ, পূর্ণবাবুর বাড়িতেই বসুধাকে দেখতে পেলাম।

বুঝলাম। গম্ভীর হতে গিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় ভাস্কর। তারপরই যেন একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।—চলি।

পরেশ—চা খাবে না?

ভাস্কর—না। কিন্তু···।

কি-যেন বলতে চায় ভাস্কর। পরেশের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে ভাস্করের চোখ দুটো যেন একটা অভিশাপের দৃশ্য সহ্য করতে থাকে।

পরেশ বলে—কি যেন বলছিলে?

ভাস্কর—তুমি আমার সঙ্গে এমন সাংঘাতিক ট্রেচারি কেন করলে?

পরেশের চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে।—তুমি তো জানতেই, ট্রেচারাস বলে আমার একটা সুনাম আছে।

বহুত মিনতি

অনাদিবাবুর এই বাড়িতে আজ সকাল হতে না হতেই যে সাড়া জেগে উঠেছে, সে সাড়া সত্যিই বড় মধুর। পাঁচ বছর আগে প্রভার বিয়ের দিন এই রকমই এক সকালে সানাই-এর সুরে বাতাস মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সারা মন প্রাণ ব্যস্ত করে দিয়ে একটা সাড়া জেগে উঠেছিল। কিন্তু আজ ঠিক সে-রকম ব্যস্ততা নয়। হাঁক ডাক না, ছুটাছুটি নয়। সেই সকালের সানাই-এর সুরে অনেক মধুরতা থাকলেও বাড়ির বুকের ভেতরটা যেন বেদনার ভারে করুণ হয়ে গিয়েছিল। এই বাড়িকেই ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দিয়ে তিন হাজার টাকা জোগাড় করে প্রভার বিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই ঋণ আজও শোধ করতে পারা যায় নি। সুদে সুদে ঋণের বোঝা আরও ভারি হয়েছে।

কিন্তু আজ মনে হয়, এতদিনে ঋণের বোঝা নামিয়ে দিতে পেরে বাড়িটা তার বুকের ভারও নামিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছে—বোধহয় এই প্রাক সুযোগ। শেখরের একটা চাকরি হয়ে যাবে, এতদিনে যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। অনাদিবাবুর বড় ছেলে শেখর তিন বছর হলো চাকরি খুঁজে খুঁজে যে শুধু হয়রান হয়েছে। আজ তাকে আর একটু পরেই তৈরী হতে হবে। যেতে হবে সেই মিশন রো। নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করে এক কারখানা, তারই অফিস। ভারত সরকারের ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য পেয়ে এই কারখানা নিজেকে ফলাও করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই কিছু নতুন কর্মী চাই, এবং একজন ভাল প্রচার অফিসার চাই। এই চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিল শেখর। দরখাস্তের উত্তরে একটি পত্রে জেনারেল ম্যানেজার শেখরকে একটি ইণ্টারভিউ মঞ্জুর করেছেন। আজ সেই ইণ্টারভিউয়ের দিন। বেলা একটার সময় অফিসে উপস্থিত হতে হবে।

গত রাতটা সারা বাড়ির প্রাণ ভালো করে ঘুমোতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। আশা, আশা, আশা। বড় স্নিগ্ধ ও সুন্দর আশা। অনাদিবাবু তাঁর পিঠের ব্যথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। রাত দশটা পর্যন্ত শেখরের সঙ্গে গল্প করেছেন।

আরম্ভে মাইনেটা কত হবে শেখর?

তিনশো ষাট থেকে আরম্ভ। বছরে দশ টাকা করে বাড়বে। দশ বছরের জন্যে কনট্রাক্ট হবে। তারপর কোম্পানির মরজি। ইচ্ছে করলে আরও দশ বছর রাখতে পারে।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে তো?

হ্যাঁ। মাইনে থেকে টাকা প্রতি এক আনা করে কাটবে। কোম্পানি দেবে দু'আনা।

অনাদিবাবু বুকে হাত বুলিয়ে আনন্দে প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠেন—আহা বেশ, চমৎকার, বড় সুন্দর ব্যবস্থা।

মধু আর বিধু, শেখরের ছোট দুটি ভাই, তারাও পড়ার বই রেখে আজ বড়দার আশে পাশে ঘুর ঘুর করে। বড়দার মুখের দিকে তাকালে ওদের একটু আশ্চর্যও লাগে। তিনশো ষাট টাকা মাইনের চাকরি হবে বড়দার; কোন রাতে ঘুমের ঘোরেও এমন সু-স্বপ্ন ওরা দেখেনি। বড়দাকে নতুন মানুষ বলে মনে হয়। মধু আর বিধু অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছে। যদি বড়দা একবার কোন কাজের জন্য ডাকেন, কপালটা টিপে দিতে বলেন? শেষ পর্যন্ত, এবং না বললেও দুই ভাইয়ে মিলে পাল্লা দিয়ে বড়দার কপাল টিপছে, তারপর বড়দারই গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ছে।

সকাল বেলায় সবার আগে জেগে উঠে ব্যস্ত হয়েছেন শেখরের মা বিভাময়ী। তিন দিন থেকে জ্বর চলছে। থাকুক জ্বর। সকালে উঠেই একবার কালীঘাট ঘুরে এসেছেন। মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদের ঠোঙা আঁচলে বেঁধে বাড়ি ফিরেছেন। তার পরেই পাশের বাড়ির গয়লাকে অনুরোধ করে এক পোয়া দুধ আদায় করেছেন। মাসটা শেষ হলেই দুধের দামটা দিয়ে দেবেন। মাস শেষ হতেই বা

আর কত বাকি ? আজ তেইশ। সাত দিন পরেই মাইনে পাবেন চৌরঙ্গীর সব চেয়ে বড় স্টোরের সব চেয়ে পুরনো ক্লার্ক অনাদিবাবু, মাইনে যাঁর পঁচাত্তর টাকা। পিঠব্যথার অসুখের জন্য মাসের মধ্যে কম করেও পাঁচটি দিন অনুপস্থিত থাকতে হয়, এবং মাইনেও কাটা যায়। গত মাসে বেয়াল্লিশ টাকা এগার আনা মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন, আর এক পেয়ালা চা মুখে দেবার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

সকাল ন'টা পার হয়েছে। অনাদিবাবু বলেন —আমার কাছে এসে একটু বস তো শেখর ! একটু গীতাপাঠ করবো।

অনেক দিন পরে বোধ হয় মনের এই নতুন আনন্দের আবেগে গীতা-পাঠ করবার জন্য অনাদিবাবুর মনটা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। গীতা পড়েন। নিজেই বুঝতে পারেন, এমন করে এত আগ্রহ নিয়ে অনেক দিন গীতা পাঠ করেননি তিনি।

বিভাময়ী রান্না ঘরের ভিতর থেকেই চেঁচিয়ে বলেন—আজ আব ঠাণ্ডা জলে স্নান করিসনি শেখর। যা শীত পড়েছে। আমি এখুনি এক হাঁড়ি জল গরম করে দিচ্ছি।

তারপরেই রান্না ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন বিভাময়ী। শেখরের কাছে এসে বসেন—এই দুধটুকু গরম গরম খেয়ে নে।

লজ্জা পায় শেখর। হেসে ফেলে।—তুমি আবার এসব কি কাণ্ড করছো মা ?

কাণ্ড আবার কিসের ? এই তো সামান্য একটু··· । কথাটা বলতে গিয়ে বিভাময়ীর গলা কেঁপে ওঠে। মনে পড়ে বোধ হয়, গত দশ বছরের মধ্যে কোনদিন শেখরকে এইভাবে সামান্য এক পেয়ালা দুধ খাবার জন্য সাধবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। পাঁচ বছর বয়স থেকে শুধু ডালভাত গিলে এত বড়টি হয়েছে ঐ ছেলে। ভগবান সহায় আছেন, দুধ-ঘি ছুঁতে না পেলেও তাঁর ছেলে রুগিয়ে যায়নি। মনে পড়ে বিভাময়ীর, ছেলেবেলায় এক মাইল দৌড়ে ফার্স্ট হয়ে প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে চেঁচিয়ে উঠেছিল ঐ শেখর—দুধ

খাই না, তবু আমার দম দেখছো তো মা!

বিভাময়ীর চোখের কোণে জল এসে পড়ছে। কিন্তু আজকের দিনে, এত বড় একটা আশার দিনে চোখে জল আনা ভাল নয়। বিভাময়ীও হেসে ফেলেন।—কাণ্ডই করছি বটে। যাক গে, আগে এই দুধটুকু খেয়ে ফেল দেখি।

টালিগঞ্জের এক গলির ভিতরে এই ক্ষুদ্র ও জীর্ণ বাড়ি শীতের সকালে রোদের ছোঁয়া না পেয়েও যেন এক মায়ানীড়ের মত আপন বুকের উত্তাপে নিবিড় হয়ে উঠেছে। মধু আর বিধুকে নিয়ে একই থালাতে খাবার খায় শেখর। অনাদিবাবু সামনে বসে চা খান। বিভাময়ীর দুই চোখ অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখেও যেন তৃপ্ত হয় না। আর একবার ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের ভিতরে যান; আরও তিনটে গরম লুচি নিয়ে এসে থালার উপর রাখেন।

টালিগঞ্জের এই ক্ষুদ্র বাড়ির সুদীর্ঘ দীনতার জীবনে এই প্রথম একটা আশার মাত্র আভাসটুকু দেখা দিয়েছে। তাইতেই এত। একটা কাণ্ডই বটে। অনাদিবাবুও হেসে ফেলেন—ব্যাপারটা কি জানিস শেখর? সারা জীবন ধরে শুধু অভাবে ভুগতে ভুগতে মনের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আশা দেখেও যেন বিশ্বাস করবার সাহস হয়না। নইলে, তোর মত কোয়ালিফাইড ছেলে একটা তিনশো ষাট টাকা মাইনের চাকরি পাবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

এই সত্য শেখরও মনে মনে স্বীকার করে। এক এক সময় হতাশ মনের যন্ত্রণায়, তীব্র বিষাদের জ্বালায় শেখরের চিন্তাগুলিও যেন জ্বলে উঠেছে। ঠিকই তো, গুণ থাকাটাই যেন অগুণ। শেখরের সহপাঠী যারা ছিল, তাদের অনেকে তো তিনশো ষাট টাকা মাইনেকে দস্তুরমত ঘৃণাই করে। এই কলকাতা সহরেই তারা কেউ হাজার টাকার এবং কেউ বা আরও বেশি মাইনেতে অখুশি হয়ে অফিসারী করছে। ভবানীপুরের ইন্দুপ্রকাশ প্রায় সারাদিন বাড়িতেই থাকে আর রেডিওর গান শোনে। শুধু বিকেল হলে গাড়ি নিয়ে হাওড়ার এক জুট মিলের অফিসে দেখা দিয়ে ফিরে

আসে। এই তো ইন্দুর কাজ। শেখর জানে, গাড়ির খরচ ছাড়া ইন্দু বারশো টাকা মাইনে পায়। ইন্দুর বাবা ইনকাম ট্যাক্সের একজন বড় অফিসার।

শেখর যে লেখাপড়ার ব্যাপারে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পেরেছে, তাই তো একটা অষ্টম আশ্চর্য। যে ছেলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফী দেবার সময় বাড়ির পিছনের জমিটাকে বেচে দিতে হয়েছিল, তাকে এম-এ পাশ করিয়েছে পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরানি বাপ। অনাদিবাবু যেন তাঁর জীবনের এক ভয়ংকর আশার নেশায় পাগলই হয়ে গিয়েছিলেন। নইলে এমন করে নিজেকে শূন্য করে দেবেন কেন? বিভাময়ীর হাতে শাঁখা আর লোহাটি ছাড়া আর কিছু নেই। সোনা-রূপা যা ছিল, তার সবই ঐ এক আশার সাধনায় উৎসর্গ করে দিতে হয়েছে। ছেলে বিদ্বান হোক, তাহলেই সব হয়ে যাবে। সব ফিরে আসবে। এমন কি দশগুণ হয়ে ফিরে আসতেও পারে।

বিভাময়ী জানেন, এবং শেখরও আজ বুঝতে পারে, অনাদিবাবুর শরীরের এই ব্যথাকাতর অবস্থা ঘটিয়েছে কিসের আঘাত?

সময় কত হলো? ঠিক বেলা একটার সময় মিশন রো-এর সেই অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। শেখর জানে, এখনও অনেক সময় আছে। ঘরের ভিতর এক কোণে সেই পুরনো চেয়ারে বসে পুরনো টেবিলের উপর রাখা বই-এর স্তূপের দিকে তাকিয়ে এখন আরও অনেকক্ষণ ভাববার সময় আছে। ভাবতে থাকে শেখর। কি প্রশ্ন এবং কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন করবেন জেনারেল ম্যানেজার? সায়েন্সের কোন দুরূহ প্রশ্ন? পলিটিক্স? ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও হতে পারে। কিংবা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্বন্ধে জটিল কোন প্রশ্ন? মনে মনে তৈরী হয় শেখর।

অনাদিবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এইবার রোদ চনচন করে উঠেছে। বেলা হয়েছে নিশ্চয়। ঘর থেকে বের হয়ে তারপর একেবারে গলি পার হয়ে মল্লিকদের বাড়ির হলঘরে উঁকি দিয়ে ঘড়ি দেখে আসেন অনাদি-

বাবু। বেলা দশটা।

আর দেরি করা উচিত নয়। মধু আর বিধুও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সকাল হতেই শেখরের একটা পাঞ্জাবি ও ধুতি সাবানকাচা করেছিলেন বিভাময়ী। সেগুলি এতক্ষণে শুকিয়েছে। মধু আর বিধু, দুই ভাই সেই ধুতি আর পাঞ্জাবি তুলে নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে ইস্তিরি করতে থাকে।

শেখরের স্নান সারা হয়ে যায় এবং ভাত খাওয়া সারা হতেও বেশি দেরি হয়না। বাড়ি থেকে বের হবার জন্য শেখর তৈরী হতেই অনাদিবাবু আর বিভাময়ী সামনে এসে দাঁড়ান। বাপ আর মা'র পা ছুঁয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে শেখর এগিয়ে যাবার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মধু আর বিধুও হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বড়দার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

অনাদিবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ বড় বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঘরের ভিতরেই দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গির ভিতরে রাখা লক্ষ্মীঘটের দিকে তাকিয়ে উল্লাসের সঙ্গে বলে ওঠেন -শুভ লক্ষণ, খুবই শুভ লক্ষণ। কি ? সকলেই চোখভরা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে লক্ষ্মী ঘটের আমপাতার উপর সুন্দর একটা প্রজাপতি এসে বসেছে। রওনা হয় শেখর। ঘরের দরজা পার হয়ে গলির সরু পথ ধরে এগিয়ে যায়। অনাদিবাবু বিভাময়ী আর মধু বিধু, চারটি মানুষের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দরজার কাছে ভিড় করে দেখতে থাকে।

শিব ! শিব ! আস্তে আস্তে হাঁপ ছেড়ে শিবনাম উচ্চারণ করেন অনাদিবাবু। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের ভিতর ঢোকেন। মধু ও বিধু আজ আর স্কুলে যেতে চায় না। বড়দা ফিরে না আসা পর্যন্ত এই গলির ভিতর ঘুর ঘুর করতে ইচ্ছা করে। কত বড় একটা ভাগ্যের ঘটনা, বড়দা আজ সেই ঘটনার নায়ক। তিনশো ষাট টাকা মাইনের চাকরি নেবার জন্য পরীক্ষা দিতে গিয়েছে বড়দা, ওদের মনের ভিতর একটা সু-স্বপ্নের নাচ শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিভাময়ী বলেন—থাক, আজ আর নাই বা স্কুলে গেলি।

অনাদিবাবু বলেন—বিকেল চারটের আগে ফিরে আসবে না শেখর। ততক্ষণ আমিই বা কি করি বুঝতে পারছি না।
বিভাময়া বলেন—তুমি এত অস্থির হয়ো না। খেয়ে দেয়ে ঘুমোও। ভগবান মাথার ওপরে আছেন।

দুই

নিবারণ সরকারের সম্পর্কে তাঁরই আত্মীয়-স্বজনদের মনে বিশেষ একটা অভিযোগ আছে। এই যে এত সাংঘাতিক একটা আর্থিক কষ্ট এই ক'বছর ধরে সহ্য করছেন নিবারণ সরকার, সেটা তাঁর নিজেরই একটা খামকা জেদের পরিণাম। আরও দুঃখের কথা, তাঁর এই জেদটাও ঠিক তাঁর নিজের জীবনের কোন জেদ নয়। আসলে এই জেদ হলো তাঁর বড় মেয়ে অবন্তীর।
কোন আত্মীয়, কোন নিকট সম্পর্কের মানুষ সামান্য কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে এবং সামান্য একটু উপকারের প্রস্তাব করলেই নিবারণবাবু সেই একই কথা আজও উচ্চারণ করেন।—অবন্তীকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি।
অবন্তী যদি রাজি হয়, তবেই রাজি হবেন নিবারণবাবু। নইলে নয়। মেয়ের ইচ্ছা আর অনিচ্ছার শাসন মাথায় তুলে নিয়ে দিন পার করে দিচ্ছেন নিবারণবাবু। কাশীপুরের গলিতে ক্ষুদ্র একটা বাড়িতে থাকেন। এক মেয়ে আর তিনটি ছোট ছোট ছেলে নিয়ে নানা অভাবের টানে হয়রান হয়েও কারও কাছে সাহায্য চাইবার জন্য ছুটে যান না। এখন তো ছুটে যাবার সামর্থ্যও নেই। রোগে অক্ষম হয়ে বিছানায় ঠাঁই নিয়েছেন। মাসের মধ্যে বড় জোর তিন চারটে দিন ভাল থাকেন। তখন লাঠি ভর দিয়ে হয় ঘরের ভিতরে, নয় গলির পথে দু'চার মিনিট পায়চারি করে এসে আবার বিছানার উপর বসে পড়েন।
পেনসন পান পঁয়ষট্টি টাকা। তাছাড়া অবন্তীও এই ক'বছর ধরে

একটা চাকরি করে। বরানগরের এক মেয়ে স্কুলে ইতিহাস পড়ায়, মাইনে পায় আশি টাকা। এই তো সর্বসাকুল্যে নিবারণ সরকারের সংসারের আয়। ছোট ছোট তিনটে ছেলে, ঐ চারু হারু আর নরু বড় হয়ে উঠেছে, এবং ওদের এখন স্কুলে ভর্তি না করে দিলেই নয়। কিন্তু খরচের কথাটা ভাবতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখেন নিবারণ বাবু, এবং অবন্তীও ভেবে কূল পায় না, কি করে দিন চলবে, যদি একটু ভাল মাইনের একটা চাকরি না পাওয়া যায়?'

আত্মীয়েরা জানেন, এবং অবন্তীও স্কুল থেকে ফিরে এসে শুধু এক পেয়ালা চা ক্লান্ত হাতে টেনে নিয়ে ভাবতে থাকে, নিবারণবাবুর কেষ্টনগরের সম্পত্তি বলতে যা ছিল, তার শেষটুকুও আজ আর নেই। বাড়ি বাগান আর ধানজমি, সবই অনেক আগেই গিয়েছে। বাকি ছিল জলঙ্গীর গা ঘেঁষে একটা ডুবো জমি, সেটাও বেচে দিতে হয়েছে সে বছর, যে বছরের একটি দিনে অবন্তীর মা এক যক্ষ্মা-হাসপাতালের বিছানায় চিরকালের মত চোখ বুঁজে নীরব হয়ে গেলেন।

সে-দিনের কিছুদিন পরেই কাশীপুরের গলির এই বাড়িতে এসেছিলেন ভাগলপুরের মাসিমা। খুব ভাল অবস্থার এক জমিদার পাত্রের খবর এনেছিলেন। অবন্তীর সঙ্গে অনায়াসেই সেই জমিদারের বিয়ে হতে পারে, যদি নিবারণবাবু রাজি হন, এবং অবন্তীর আপত্তি না থাকে।

তখনও অবন্তীর কলেজের পড়ার পালা শেষ হয় নি, ফোর্থ ইয়ারের সবটাই বাকি। ভাগলপুরের মাসিমা জানিয়েছিলেন, যদি অবন্তী বিয়ে করতে রাজি থাকে, তবে সেই জমিদার পাত্র আরও এক বছর বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি আছে। অবন্তীর পড়ার সব খরচ দেবে সেই পাত্র। এমন কি কাশীপুরের এই অভাবগ্রস্ত সংসারের ভরণপোষণের সব দায় নিতেও সে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু রাজি হয়নি অবন্তী। অবন্তী বলেছিল—ওভাবে বিক্রি হয়ে যেতে ইচ্ছে করে না মাসিমা।

াসিমা রাগ করে চলে গিয়েছিলেন। মাসিমার সেই রাগ দেখে খুশি হয়েছিল অবন্তী। এবং একবেলা উপোস করেও খরচ বাঁচিয়ে আর একটা বছরের মত কলেজের পড়ার খরচ যোগাড় করবার জন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

মিথ্যে হয়নি অবন্তীর সেই প্রতিজ্ঞা। প্রায় একবেলা উপোস করার মতই, অনেক রিক্ততা সহ্য করে, নিবারণবাবুর সামান্য পেনসনের টাকার মধ্যেই সব খরচ কুলিয়ে পরীক্ষার ফী পর্যন্ত দিতে পেরেছিল অবন্তী।

অভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনের এতগুলি বছর পার হয়ে গিয়েছে যে মেয়ের, তার মনের গভীরে একটা গর্ব আছে। সেই গর্ব হলো একটা প্রতিজ্ঞা। এই অভাবের জীবন থেকে নিজের চেষ্টার জোরে মুক্তি পেতে হবে। কারও সাহায্যের দরকার নেই। কারও মুখের সহানুভূতির কথা শোনবার দরকার হয় না। আর, সহানুভূতি ও উপকারের প্রতিশ্রুতিগুলির ঐ তো ছিরি! ভাগলপুরের মাসিমার প্রস্তাবের মত। একবার উপকার করে পাঁচবার কৃতজ্ঞতা দাবি করবে। সম্মানটুকু কেড়ে নিয়ে শুধু করুণার পাত্র করে রাখবে। কোন দরকার নেই।

নিবারণবাবুও বলেন, তুই যদি মনে করিস অবন্তী, কারও উপকারে ও সাহায্যে কোন দরকার নেই, তবে আমিও মনে করি, কোন দরকার নেই।

জীবনের এই জেদ, এই প্রতিজ্ঞা, আর এই গর্বের আবেগটুকু বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে অবন্তী সরকারের মত আশি টাকা মাইনের এক মেয়ে-টিচারকে এবং পঁচিশ বছর বয়সের একটা মেয়েলী জীবনকে আরও যে একটা কঠোর পরীক্ষা সহ্য করতে হচ্ছে, তার ইতিহাস এই পৃথিবীতে এখনও অবন্তী ও নিখিল ছাড়া আর কেউ জানে না। এবং বোধ হয় কেউ কল্পনা করতেও পারবে না যে, একটা গরীবের বাড়ির মেয়ের প্রাণেও এত অহংকার থাকে! নিখিল মজুমদার আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, এভাবে এতবড় জেদ নিয়ে কোন মেয়ে কি

কখনও কাউকে ভালবেসেছে ?

নিখিল মজুমদার তার আশ্চর্যের কথা অবন্তীর কাছে কতবার মুখ খুলে বলেও ফেলেছে। শুনে অবন্তীর দুচোখের দৃষ্টিতে যেন শান্ত প্রদীপের আলোর মত একটা নিবিড় তৃপ্তির আভা ফুটে ওঠে।

নিখিল বলে—ভালবাসতে পারে তো অনেকেই, কিন্তু তোমার মত এমন করে নিজের সর্বনাশ করে কেউ ভালবাসতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না।

অবন্তী—বড় বেশি বাড়িয়ে প্রশংসা করছো নিখিল। তোমার দরকারের জন্য সামান্য কয়েকটা টাকা দিতে পারছি, এর মধ্যে কোন অদ্ভুত মহত্ত্ব নেই। ওসব কথা শুনলে আমি লজ্জা পাই।

সকালবেলা শ্যামবাজারে গিয়ে ডাক্তার রায়ের মেয়ে ডলিকে এক ঘণ্টার মত অঙ্ক শিখিয়ে আসতে হয়, ত্রিশটা টাকা পাওয়া যায়, এবং সেই টাকাটা প্রতি মাসে নিখিল মজুমদারের হাতে তুলে দেয় অবন্তী। টাকাটা পরিমাণে সামান্য হলেও নিখিলের কাছে সে টাকা একটা সৌভাগ্যেরই মত। কারণ সেই টাকাতেই নিখিলের মেসের অর্ধেক খরচ কুলিয়ে যায়।

নিখিলের জীবনও প্রতীক্ষায় আছে। একটা ভাল সার্ভিসের আশায় দিন গুনছে নিখিল। শুধু বসে বসে দিন গোনা নয়। বেচারা প্রাণপণে চেষ্টাও করছে। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসের ভিড়ের ভিতর ঠেলাঠেলি করে উঠে রোজই সকালে চলে যেতে হয় অনেক দূরে, পটলডাঙ্গা থেকে সেই বেহালায়। সেখানে এক পারফিউমারিতে অ্যাপ্রেন্টিস কেমিস্ট হয়ে রোজ অন্তত দশটা ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এই কাজের মাইনে নেই, শুধু প্রসপেক্ট আছে। আর আছে সামান্য অ্যালওয়েন্স, পঞ্চাশ টাকা।

অবন্তী বলে—তোমাকে আমি সামান্য একটু সাহায্য করতে পারছি, এটা যে আমারই তৃপ্তি।

হ্যাঁ তৃপ্তি। বোধ হয় অবন্তী সরকারের জীবনের সুন্দর একটা জেদের তৃপ্তি। নিজের ভালবাসার অদৃষ্টকেও নিজের হাতে গড়ে তুলবার

তৃপ্তি। গরীব বলেই কি জগতের কাউকে উপকার করবারও ক্ষমতা থাকবে না, সুযোগ থাকবে না, অধিকার থাকবে না? স্বীকার করে না অবন্তী। স্বীকার করতে চায় না অবন্তীর জীবন। ডলিকে অঙ্ক শিখিয়ে যে ত্রিশটা টাকা প্রতিমাসে পাওয়া যায়, সেই টাকা চারটে মাস ধরে জমালে একটা হাতঘড়ি কিনতে পারা যায়, এবং সত্যিই একটা হাতঘড়ি অবন্তীর খুব দরকার হয়ে পড়েছে! কিন্তু দরকার নেই কিনে; তার চেয়ে বরং মনটা অনেক বেশি খুশি হয়ে যায়, যখন মনে পড়ে অবন্তীর, ঐ টাকাটা নিখিলের জীবনে সামান্য একটু উপকারে সার্থক হতে পারছে।

প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে বোধহয় এইভাবে প্রাণেরই খানিকটা ভালবাসার মানুষের সুখের জন্য ক্ষয় করে দিতে পারা যায়। অস্বীকার করে না অবন্তী. নিখিলকে এভাবে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে ভাল লাগে। অথচ এক বছর আগে এই নিখিলকে চিনতোও না অবন্তী, নিখিলের নাম পর্যন্ত শোনেনি।

অবন্তীরই স্কুলের বান্ধবী, যার নাম যমুনা, তারই দাদা হয় নিখিল। যমুনার আপন কাকার বড় ছেলে নিখিল।

যমুনার কোন কাকা আছে, এবং সে কাকার ছেলে নিখিল নামে এরকম সুন্দর চেহারার একটা মানুষও পৃথিবীতে আছে, এসব খবর অবন্তীরও কোনদিন জানা ছিল না। জানতে পেরেছিল প্রথম সেদিন, যেদিন হঠাৎ ট্রামের মধ্যে যমুনার সঙ্গে অবন্তীর দেখা হয়ে গেল। অনেক দিন পরে দেখা। সেই যমুনা, যার শরীরটা একেবারে হালকা লতার মত ছিপছিপে ছিল, আর স্কুলের প্রাইজের দিনে ফুলের মঞ্জরী খোঁপায় দুলিয়ে ফুরফুর করে নাচতো। সেই যমুনার চেহারাটা কী গম্ভীর আর কী ভারিক্কি হয়ে গিয়েছে!

কিন্তু সেইরকমই ছটফটে হাসি হেসে অবন্তীর হাত ধরেছিল যমুনা, এবং ট্রাম থেকে নেমে অবন্তীকে হাত ধরে সোজা নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা আর পাঁপড় খাইয়েছিল।

যমুনার ঘরের চেহারা দেখেই বুঝে ফেলতে দেরি হয়নি অবন্তীর,

যমুনার অবস্থা বোধ হয় অবন্তীর অবস্থার চেয়েও রিক্ত। একটি ছোট ঘর, এক ফালি বারান্দা। পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই ঘরে থাকে যমুনা। যমুনাই বলে—সত্তর টাকা মাইনের ভদ্রলোকের ঘর এর চেয়ে বেশি ভাল হয় না অবন্তী।

সেই যমুনার বাড়িতে, সেই এক ফালি বারান্দার এক কোণে একটি সুন্দর চেহারার মানুষকে গম্ভীর ভাবে বসে থাকতে দেখে অবন্তীই প্রশ্ন করেছিল, কে ঐ ভদ্রলোক?

যমুনা—আমার দাদা, আমার দিনাজপুরের কাকার ছেলে।

অবন্তী আর কোন প্রশ্ন করেনি। কিন্তু অবন্তীর মনের নীরব প্রশ্নগুলির উত্তর যমুনারই একটানা যত আবোল-তাবোল আক্ষেপের ভাষাগুলির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল। চুপ ক'রে, এবং খুবই গম্ভীর হ'য়ে শুনেছিল অবন্তী।

যমুনা বলে—আমার দিনাজপুরের কাকার অবস্থা প্রায় আমার এই স্বামীর বাড়ির অবস্থারই মত। আরও দুঃখের কথা কি জান? এত বিদ্বান হয়েও নিখিলদা বেচারা আজ পর্যন্ত একটা চাকরি যোগাড় করতে পারলেন না।

একটু চুপ করে থেকে যমুনা বলে তোমার কাছে দুঃখের কথাই বলতে ভাল লাগছে, তাই বলছি। মেসে, হোটেলে থাকবার মত টাকা নেই বলেই নিখিলদা আমার এখানে এসে উঠেছেন। কিন্তু এসেই তো ভগ্নীপতির অবস্থা দেখে চক্ষু চড়ক গাছ। তাই···।

অবন্তী—কি?

যমুনা—তাই চলে না যেয়ে আর উপায় কি বল? আজই দিনাজপুরে চলে যাবেন নিখিলদা।

অবন্তী—চাকরির চেষ্টা করবেন না?

যমুনা—কলকাতার মত খরচে জায়গায় দুটো মাস থাকতে পারবেন, তবে তো চাকরির চেষ্টা করবেন?

চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে যমুনা।—আমারও সাধ্যি নেই যে, নিখিলদাকে এখানে থাকতে বলি। সত্তর টাকা মাইনের জীবন,

আমি যে বাচ্চাগুলিকেও মাঝে মাঝে না খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি অবন্তী !

অবন্তীও রুমাল তুলে চোখ মুছেছিল, এবং অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ ক'রে বসেছিল। তার পরেই, যমুনার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়, কে জানে কেন, অবন্তীর মুখের চেহারাটা হঠাৎ অদ্ভুত রকমের হয়ে গেল। এক ঝলক রক্তের আভা চমকে উঠেছে সারা মুখে। আর, চোখ দুটোর কালো নিবিড়তা যেন আরও নিবিড় হয়ে গিয়েছে। থমকে দাঁড়ায় অবন্তী, এবং নিজেরই মনের গভীরে একটা দুঃসাহসের নির্লজ্জতাকে সব নিঃশ্বাস দিয়ে জোর করে চেপে স্তব্ধ ক'রে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না বোধ হয়। তাই হঠাৎ বলে ওঠে—তোমার নিখিলদার সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দাও যমুনা।

অতীতের এই ইতিহাস রোজই একবার স্মরণ করা অবন্তী সরকারের প্রতিদিনের জীবনের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। স্কুলে যাবার সময় যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ হাতের কাছে বই টেনে নিয়ে যার কথা ভাবে অবন্তী, সে হলো নিখিল। আর, এই ভাবনারই ঘোরের মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠে এক একদিন দেখতে পায়; সকাল বেলার আকাশের সব উজ্জ্বলতা যেন নিজের মুখের হাসির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নিখিল এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রায়ই আসে নিখিল, এবং আজও আসবার কথা। কারণ, অবন্তী জানে, আজকের দিনটা হলো নিখিলের ছুটির দিন।

অবন্তীরও আজ স্কুলে যাবার তাড়া নেই। আজকের মত ছুটি নিয়েছে অবন্তী, কারণ আজ অবন্তী সরকারেরও অদৃষ্টের একটা পরীক্ষার দিন, যদিও সে পরীক্ষার কথা নিখিলও জানে না।

ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ একবার হেসে ওঠে অবন্তীর চোখ। না, আজই নিখিলকে এই পরীক্ষার কথাটা বলে দিয়ে লাভ নেই। পরীক্ষাটা হয়ে যাক, এবং যদি সেই পরীক্ষায় সত্যিই সফল হওয়া যায়, তবেই নিখিল মজুমদারকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য ক'রে দিতে

পারবে অবন্তী।

সকাল দশটাও যখন বেজে গেল, তখন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে অবন্তী। না, আর তো নিখিলের অপেক্ষায় বসে থাকবার মত সময় নেই। এখুনি যে একবার ঘরের বাইরে গিয়ে, কাশীপুরের এই গলি থেকে বেশ কিছু দূরে এক সৌভাগ্যের সম্ভাবনার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

দরজার কাছে পরিচিত পায়ের শব্দ শোনা যায়, এবং অবন্তীর ভাই হারু চেঁচিয়ে জানিয়ে দেয়—নিখিলবাবু এসেছেন দিদি।

নিখিলের মুখের দিকে তাকালেই অবন্তী সরকারের দুই চোখে যে হাসির অভ্যর্থনা জেগে ওঠে, সে হাসি আজ যেন আরও একটু বেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয় অবন্তী; এবং ওর চোখের হাসিও মুছে যায়। অবন্তীর মুখটাও সেই মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে ওঠে। বড় বেশি গম্ভীর ও বিষণ্ণ মূর্তি নিয়ে এবং যেন ব্যথিত অপরাধীর মত করুণ হয়ে অবন্তীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নিখিল।

তোমার কি কোন অসুখ করেছে? প্রশ্ন করে অবন্তী।

নিখিল বলে—না।…আমি এসেছি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে।

কি বললে? বিদায় নিতে? প্রশ্ন করতে গিয়ে অবন্তীর চোখের তারা দুটো শিউরে ওঠে।

নিখিল বলে—হ্যাঁ।

অবন্তী—কেন? আমার কি অপরাধ হলো?

নিখিল হাসে—আমি অপরাধী, তুমি কেন মিছে নিজেকে নিন্দে করছো অবন্তী?

অবন্তী—তুমি অপরাধী কেন হবে?

নিখিল—আমার ভাগ্যটাই অপরাধী।

অবন্তী—তার মানে?

নিখিল—আর কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়।

কেন?

বেহালার পারফিউমারি জানিয়ে দিয়েছে, পঞ্চাশ টাকা অ্যালওয়েন্স দিয়ে সখের কেমিস্ট পুষবার ওদের আর দরকার নেই। স্তব্ধ হয়ে শুধু শুনতে থাকে অবন্তী। অবন্তীরই ভালবাসার জীবনকে হতাশ করে দিয়ে সুখী হবার জন্য একটা নিষ্ঠুর চক্রান্ত যেন নিখিলের ঐ সামান্য পঞ্চাশ টাকার একটা অ্যালওয়েন্সকেও ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে। সত্যিই তো, নিখিলের পক্ষে আর কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়। মেসে থাকতে হলে প্রতি মাসে যে ষাট-সত্তর টাকা দরকার হয়, সে টাকা আসবে কোথা থেকে? অবন্তী সরকারের পক্ষেও যে নিখিলের দরকারের সব টাকা যোগাড় ক'রে দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব। নিজে একবেলা উপোস ক'রে থাকলেও সম্ভব নয়।

অবন্তীর চোখ দুটোও যেন স্তব্ধ হয়ে একটা দুঃসহ বেদনার জ্বালা সহ্য করতে থাকে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে অবন্তীরই সেই স্বপ্ন; আজ না হোক কাল, না হয় আর কয়েক মাস পরে, বড় জোর আর এক বছর পরে নিখিল মজুমদারের একটা ভাল চাকরি হয়েই যাবে। তারপর, আর কি? নিবারণবাবুকে কিংবা বান্ধবী যমুনাকে একেবারে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না অবন্তী। অবন্তী আর নিখিলের এক বছরের ভালবাসার দাবি এক শুভ সন্ধ্যার উৎসবে এসে সবাকার চোখের সামনেই ফুলের মালা হয়ে যাবে। কিন্তু অবন্তীর আজ মনে হয়, সে মালার ফুলগুলিকেই যেন একটা নির্মম দুর্ভাগ্যের হাত এসে সরিয়ে দিতে চাইছে।

অবন্তী—তাহ'লে তুমি এখন কোথায় যাবে? দিনাজপুর?

নিখিল—না। আমি যাব কানপুর।

অবন্তী—কেন?

নিখিল—কানপুরের ট্যানারিতে একটা কাজ পেয়েছি। মাইনে একশো টাকা। তার মানে শুধু বেঁচে থাকতে পারবো।

মাথা হেঁট করে অবন্তী, মাথাটা ভার ভার বোধ হয়। নিখিলের কানপুর যাওয়া বন্ধ করতে পারে, আশি টাকা মাইনের টিচারের

জীবনে সে ক্ষমতা কোথায়? ভালবাসতে পারে কিন্তু ভালবাসার মানুষকে ধরে রাখতে পারে না, তাকেই বোধ হয় বলে নারীর জীবন। এই জীবনের হাসিগুলিও যে মুখচোরা কান্না, এই সত্য কল্পনাতেও কখনও এভাবে বুঝতে পারেনি অবন্তী।

নিখিল বলে—তোমার কাছে ফিরে আসবার জন্যই আজ বিদায় নিচ্ছি অবন্তী।

তার মানে? অবন্তীর মুখের প্রশ্নটা যেন অভিমানে তপ্ত হয়ে বেজে ওঠে।

নিখিল বলে—তার মানে তোমার ভালবাসার কাছ থেকে তো বিদায় নেবার আমার সাধ্যি নেই অবন্তী।

উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন নীরব হয়ে ভাবতে থাকে অবন্তী। তাকের উপর রাখা ছোট টাইম-পীসের দিকে তাকায়। এগারটা বেজে গিয়েছে।

চমকে উঠে, এবং চোখের চাহনীকেও উতলা করে হঠাৎ প্রশ্ন করে অবন্তী—আজই তোমার কানপুর রওনা না হলেই কি নয়?

নিখিল—একটা দিনই বা দেরি ক'রে লাভ কি?

অবন্তী—লাভ আছে। তুমি মাত্র একটি দিন আমাকে সময় দাও। মাত্র একটি দিন। দেখি, কি বলে আমার ভাগ্য।

নিখিল আশ্চর্য হয়—তুমি এসব কি বলছো অবন্তী?

অবন্তী—বিশেষ কিছুই বলছি না। শুধু তোমাকে আর একটি দিন কলকাতায় থাকতে বলছি। তারপর এস, যদি দুর্ভাগ্য হয়, তবে তোমাকে বিদায় দেব।

সকালে মাত্র এক পেয়ালা চা খাওয়া হয়েছে, এবং এখন ঘরের বাইরে যেতে হলে যে সামান্য একটু ডাল-ভাত মুখে না গুঁজে চলে যাওয়া উচিত নয়, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার মত মানুষ আজ আর এই বাড়িতে নেই। এবং অবন্তীও আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে, শুধু শাড়ির আঁচলটাকে সামান্য একটু গুছিয়ে কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে তৈরী হয়।—আমাকে এখনি একবার বাইরে যেতে হবে নিখিল।

নিখিল বলে—আমিও এখন তাহলে আসি।

অবন্তী বোধ হয় শুনতেই পায়নি। এবং বোধ হয় বুঝতে পারে না যে, নিখিলও অবন্তীর পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। নিজেরই উতলা মনের আবেগে ছটফট ক'রে, এবং একটা নতুন প্রতিজ্ঞার মত্ততা নিয়ে পথ চলতে থাকে অবন্তী। —দেখি ভাগ্য আমাকে ঠকাতে পারে, না আমিই ভাগ্যকে ঠকিয়ে……।

স্টপের কাছে বাস এসে থেমেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিখিল। বাসের ভিতরে উঠে পড়ে অবন্তী। ছুটে চলে যায় বাস।

তিন

মিশন রো'র সাততলা বাড়ির তিনতলার বিরাট এক প্রকোষ্ঠে দি এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডের অফিস। কারখানাটি আসানসোলে। অফিসের বিরাট প্রকোষ্ঠ মেহগনির পার্টিশন দিয়ে সারি সারি কামরায় ভাগ করা। সব চেয়ে বড় কামরাটির স্প্রিং-ডোরের ওপারে রঙীন সাটিনের পর্দা ঝোলে। পাশেই কাঠের পার্টিশনের গায়ে পিতলেব নেমপ্লেট ঝকঝক করে—জেনারেল ম্যানেজার।

বাইরে বারান্দার উপর এক সেট সোফা। তকমা পরা চাপরাসি ঘোরাফেরা করে। বারান্দার দেয়ালঘড়িতে তখন বারটা বাজে। লিফটের খাঁচা থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যায় শেখর।

নোটিস বোর্ডের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, দেখা যায়, জেনারেল ম্যানেজার যথারীতি নোটিস দিয়েছেন। বেলা ঠিক একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ইন্টারভিউ-এর জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। দেখে খুশি হয় শেখর, সাক্ষাৎপ্রার্থীর সংখ্যা বেশি নয়। মাত্র দু'জন এক, শেখর মিত্র। দুই, অবন্তী সরকার।

কে এই অবন্তী সরকার? কোন মহিলা বলেই মনে হয়। মিস বা মিসেস কিছুই লেখা নেই। যাক গে, এগিয়ে এসে সোফার উপর

বসে থাকে শেখর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনটা বিমর্ষ হয়ে যায়। অবন্তী সরকার নামে প্রার্থীটি শেখরের তুলনায় যদি বেশি শিক্ষিত হয় আর বেশি যোগ্য হয়, তবে?

বিশ্বাস হয় না। অবন্তী সরকারের কি দু'বছর ধরে ফিজিক্সে রিসার্চের রেকর্ড আছে? অবন্তী সরকার কি শেখরের মত কোনদিন লণ্ডনের কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছে আর প্রশংসা পেয়েছে? শেখরের মত ইণ্টারভার্সিটি ডিবেটে মেড্যাল পেয়েছে কি অবন্তী সরকার? বিশ্বাস হয়না। মনের বিমর্ষতা মনের জোরেই মুছে ফেলতে চেষ্টা করে শেখর।

মনের জোর আছে শেখরের। ভাগ্যের কৃপা নামে কোন বিচিত্র বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না শেখর। সংসারের কাছে সুবিচার আর ন্যায় পাওয়া যায়, এটাও একটা অবাস্তব বিশ্বাস বলে মনে করে শেখর। তার ত্রিশ বছর বয়সের এই জীবন বলতে গেলে একটা মোহভঙ্গের জীবন: যোগ্য হলেই সেই যোগ্যতার মূল্য পাওয়া যাবে, এমন মোহ পোষণ করে না শেখর। দি এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডের প্রচার অফিসারের চাকরিটাকে পাওয়া যাবে বলে শেখরের মনের ভিতর যে আশা দেখা দিয়েছে, সে আশা হলো সংসারের খামখেয়ালের উপর একটা আশা। কে জানে, জেনারেল ম্যানেজার হয়তো মনের ভুলে, কিছু না ভেবে-চিন্তে, শুধু একটা হঠাৎ খেয়ালের বশে শেখরকেই কাজের উপযুক্ত বলে মনে করে ফেলতে পারেন। মনে পড়ে ইন্দুপ্রকাশের সেই কথাটা। ইন্দু অনেকবার হেসে হেসে বলেছে, তোর সবচেয়ে বড় ড্র-ব্যাক হলো তোর ঐ মেরিট। তুই সব দিক দিয়ে যোগ্য, তাই তুই অযোগ্য। তোর ভাল চাকরি হতে পারে না, শেখর; অসম্ভব।

ইন্দুর কথাগুলি তখন বিশ্বাস করতে পারেনি শেখর। কিন্তু গত তিন বছরের চেষ্টার ইতিহাস স্মরণ করলে ইন্দুকে বাস্তবিক ভূয়োদর্শী ঋষি বলে মনে হয়। কত জায়গায় কত রকমের সার্ভিসের জন্য দরখাস্ত করেছে শেখর, কিন্তু দরখাস্তের একটা উত্তর পর্যন্ত আসেনি।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে দি এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডকে অনেক সভ্য বলে মনে হয়। সাক্ষাৎ দেখা করবার জন্য একটা পত্র দিয়েছে। শেখরের জীবনে এই বোধ হয় পৃথিবীর কাছ থেকে প্রথম ভদ্র ব্যবহার লাভের সৌভাগ্য।

বার বার মনে পড়ে, ঐ অবন্তী সরকার নামটা। শেখরের সৌভাগ্যের পথে কাঁটার মত ঐ অবন্তী সরকার, যার মূর্তি এখনও দেখা দেয়নি। এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডকে নয়, জেনারেল ম্যানেজারকে নয়, অবন্তী সরকারকেই শেখরের আজকের এত বড় আশার সব চেয়ে বড় শত্রু বলে মনে হয়। টালিগঞ্জের সেই ছোট বাড়ির রাতজাগা চোখের স্বপ্ন এবং সারা সকালের আশার উৎসব মিথ্যে করে দিতে পারে ঐ অবন্তী সরকার, আর কেউ নয়।

লিফট উঠছে উপরে, শব্দ শোনা যায়। শেখরের নিঃশ্বাসের ছন্দও হঠাৎ কেঁপে ওঠে। অবন্তী সরকার এল নাকি?

হ্যাঁ, এই বোধ হয় অবন্তী সরকার। ঐ যে অদ্ভুতভাবে সেজে, কিংবা না সেজেই অদ্ভুত রকমের স্নুন্দর হয়ে এক তরুণী লিফটের খাঁচা থেকে নেমে এই অফিস ঘরেরই দেয়ালের গায়ের নেম-প্লেটগুলি পড়তে পড়তে এদিকে আসছে। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, মাথার উপর কাপড় টানাও নয়। নিশ্চয় উনি মিস, মিস অবন্তী সরকার।

দেখতে থাকে শেখর, আগন্তুকা তরুণী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে, আর একাগ্র দৃষ্টি তুলে নোটিস বোর্ডের সেই নোটিসটাকেই পড়ছে। আর কোন সন্দেহ নেই, উনিই হলেন শেখরের এত আশার চাকরিটার প্রার্থিনী, শেখরের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তরুণীর চোখ ছুটোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, চকচকে বুদ্ধির আভা খেলছে সেই ছুচোখের ছুই তারার আশে পাশে। ঐ ছুই চোখ যদি একটু সজল হয়ে জেনারেল ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকায়, তবে সত্য-মিথ্যার বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। সন্দেহ করে শেখর। ঐ ছুটি স্নুন্দর কালো চোখের জোরেই চাকরিটা পেয়ে যাবে বলে একটা ধ্রুব বিশ্বাস নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অবন্তী সরকার। অবন্তী

সরকার এতক্ষণে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সোফার দিকে এগিয়ে আসতেই শেখরের চেহারাটাকে দেখতে পায়; এবং সেই তুই কালো চোখ যেন হিংস্থক সাপিনীর চোখের মত তাকিয়ে থাকে। নোটিস বোর্ডের লেখা পড়েই বুঝতে পেরেছে অবন্তী সরকার, শেখর মিত্র নামে লোকটাই সোফার উপর বসে রয়েছে।

সোফার দিকে আর এগিয়ে আসে না অবন্তী সরকার, যদিও তুটো সোফা খালি পড়ে আছে। যেন শেখর মিত্রের ছায়ার কাছে আসতেও ঘৃণা বোধ করছে অবন্তী সরকার। দূরে সরে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে পথের জনতার স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি দেখছে, দেখবার কি আছে, তা সে-ই জানে। শেখর দেখতে পায়, জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো অবন্তী সরকার। মনে হয় শেখরের, অবন্তী সরকাবের সেই কালো চোখের চকচকে বুদ্ধি হঠাৎ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকায় শেখর। একটা বাজতে আর পনের মিনিট বাকি। জেনারেল ম্যানেজারের কামরা থেকে আহ্বান আসবার সময় নিকট হয়ে এসেছে। অফিস-ঘরের ভিতর থেকে হঠাৎ এক কেরানিবাবু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন—

আপনি শেখর মিত্র? ইণ্টারভিউ আছে?

শেখর বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেরানিবাবু—আর অবন্তী সরকার?

ছুটে আসে তরুণী। কেরানিবাবুর সামনে এগিয়ে এসে বলে—

আমি অবন্তী সরকার।

কেরানিবাবু বলেন—বাস্, তাহ'লে আর পনের মিনিট অপেক্ষা করুন।

কেরানিবাবু চলে যেতেই অবন্তী সরকার আর কোন দিকে না তাকিয়ে একটা সোফার উপর বসে পড়ে। হাতের ছোট ব্যাগটিকে কোলের উপর রেখে আর তুহাতে জড়িয়ে চুপ করে বসে থাকে। শেখর মিত্র অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অস্বস্তি বোধ করে শেখর।

অবন্তী সরকারের এই সান্নিধ্য একটা অভিশাপের মত মনে হয়।
দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর একবার রুমাল দিয়ে কপাল মোছে অবন্তী সরকার। তারপর আনমনা শেখর মিত্রের ভাবনাগুলিকে একেবারে চমকে দিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।
শেখর অপ্রস্তুতভাবে বলে—তা হয় তো দেখেছেন।
বলতে গিয়ে শেখরও যেন অবন্তী সরকারের মুখের দিকে অতীতের একটা স্মৃতির আবছা চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে; তারপর বলেও ফেলে—আপনাকেও যেন কোথায় দেখেছি।
তরুণী প্রশ্ন করে—আচ্ছা, আপনি কি অনসূয়ার বউদি প্রভার কেউ হন?
আশ্চর্য হয় শেখর—হ্যাঁ, প্রভা আমার বোন।
অবন্তী সরকার বলে—হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছি। প্রভার শ্বশুর-বাড়িতে, তার মানে অনসূয়াদের বাড়িতে আপনাকে একবার দেখেছি। অনেকদিন আগে। বোধ হয় চার বছরেরও আগে।
শেখর—তাই বলুন। আমারও এখন মনে পড়ছে। প্রভার ননদ অনসূয়ার বন্ধু আপনি। তাই না?
অবন্তী সরকার হাসে—হ্যাঁ। আপনারও দেখছি খুব স্পষ্ট মনে আছে।
শেখর—মনে থাকবারই কথা। আপনি ভূতের গল্প বলে সন্ধ্যাবেলা প্রভাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আমি উপস্থিত হয়েছিলাম।
অবন্তী সরকার এইবার স্বচ্ছন্দে হেসে ফেলে—আসল ব্যাপারটা তো জানেন না। অনসূয়া বলেছিল, তার বউদি প্রভা নাকি ভয়ানক সাহসী মেয়ে। তাই আমি অনসূয়ার সঙ্গে বাজি রেখে প্রভাকে ভূতের গল্প বলে ভয় দেখিয়েছিলাম, আর বাজি জিতেছিলাম।
একটা বাজতে আর দশ মিনিট। হঠাৎ অবন্তী সরকার মুখ গম্ভীর করে। চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। বোধ হয়, শেখর মিত্রের

উদ্দেশ্যটাকেই আবার মনে পড়ে গিয়েছে। এই লোকটাই তো অবন্তী সরকারের আশায় বাদ সাধতে এসেছে। শেখর মিত্র যে অবন্তী সরকারের ভাগ্যের শত্রু।

গম্ভীর মুখ ঘুরিয়ে, আস্তে আস্তে দু'চোখের দৃষ্টির তিক্ততাকে কোন মতে হাসিয়ে একটু মিষ্টি করে নিয়ে অবন্তী সরকার বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, কিছু মনে করবেন না।

শেখর—বলুন, মনে করবার কি আছে ?

অবন্তী—আচ্ছা, আপনি হঠাৎ এই চাকরিটা নেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন ?

শেখর—তার মানে ?

অবন্তী—এই তিনশো ষাট টাকা মাইনের একটা চাকরি, একটা কারখানার পাবলিসিটি অফিসারের কাজ ছাড়া অন্য কত ভাল কাজ তো আছে।

শেখর হাসে—আছে তো, কিন্তু থাকলেই বা কি ?

অবন্তী—আপনি সেই সব ভাল কাজের জন্য চেষ্টা করুন না কেন ? আপনার যা কোয়ালিফিকেশন, তাতে ইচ্ছে করলে আপনি তো অনায়াসে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের কোন বড় দপ্তরে একটা ভাল সার্ভিস পেতে পারেন।

শেখর হাসে—ইচ্ছে করলেই পেতে পারি না। যদি দেয়, তবে নিতে পারি।

অবন্তী—যাই বলুন, আপনার মত মানুষের পক্ষে এরকম একটা সাধারণ চাকরি নেওয়া সাজে না।

শেখর আশ্চর্য হয়—না জেনে আমাকে বড় বেশি প্রশংসা করছেন আপনি। আমার পক্ষে কি সাজে বা না সাজে সেটা আমি জানি।

অবন্তী—আমি আপনার বোনের ননদ অনসূয়ার কাছে সবই শুনেছি। আপনি ফিজিক্সে রিসার্চ করেছেন। আপনার ইউনিভার্সিটির রেকর্ড চমৎকার। আপনি ইংরেজী ও বাংলা কাগজে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

শেখর—কি আশ্চর্য, চার বছর আগে প্রভার ননদ আপনাকে যে সব কথা বলেছে, সে-সব আজও এত স্পষ্ট করে মনে করে রেখেছেন ?

অবন্তী—মনে থেকে গেছে। তাই বলছি···আপনি এই কাজটা নেবেন না।

চমকে ওঠে শেখর। অবন্তী সরকারের আবদার প্রলাপের মত মনে হয়। কোথা থেকে এসে অভিভাবিকার মত উপদেশ দিয়ে শেখর মিত্রের হিতাহিত বোঝাতে শুরু করে দিয়েছে। অবন্তী সরকারের বুদ্ধির দুঃসাহস তো কম নয় !

শেখর বলে—এই চাকরিটা নেওয়া বা না নেওয়া আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। হ্যাঁ, যদি দেয়, তবে নেবই। আপনি ওরকমের অদ্ভুত অনুরোধ করবেন না।

অবন্তী সরকারের মাথাটা যেন হঠাৎ একটা অদৃশ্য বোঝার ভারে ব্যথিত হয়ে ঝুঁকে পড়ে। অনুরোধটা অদ্ভুতই বটে। এমন অদ্ভুত অনুরোধ করবার অধিকার কোথা থেকে পেল অবন্তী সরকার ? বোকা নয় শেখর মিত্র। বুঝতে তার একটুও দেরি হয়নি। অবন্তী সরকারের কালো চোখের চকচকে বুদ্ধি শেখর মিত্রকে স্তুতির ছলে দুর্ভাগ্যের ধুলোয় বসিয়ে দিয়ে নিজের জন্য এই চাকরির পথটাকে স্বচ্ছন্দ করে নিতে চায়।

একটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। হেঁট মাথা তুলে শেখরের দিকে তাকায় অবন্তী সরকার। এইবার বুদ্ধিমান শেখর মিত্রেরই চোখ দুটো একটু ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে। কারণ, ছলছল করছে অবন্তী সরকারের চোখ। অবন্তীর কপালের একটা দিক ঘামে পিছল হয়ে গিয়েছে। ঠোঁট দুটো থরথর করছে।

কি হলো আপনার ? প্রশ্ন করে শেখর মিত্র।

অবন্তী সরকার বলে—আপনি আমাকে চিনতে পারলে আমার অনুরোধটাকে অদ্ভুত বলতে পারতেন না।

শেখর—আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না।

অবন্তী—আপনি জানেন না, আমি কেন, কিসের জন্য, কি অবস্থায় পড়ে এই চাকরিটা নেবার জন্য তৈরী হয়েছি।

শেখর—না জানলেও বুঝতে পারছি, চাকরিটা পেলে আপনার সুবিধা হয়।

অবন্তী—সুবিধা? শুধু সুবিধা নয় শেখরবাবু। পেলে বেঁচে যাই। শুধু আমি নই, আরও অনেকে।

শেখর—আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

অবন্তী—বাবা আছেন। তিনটি ছোট ছোট ভাই আছে।

শেখরের বুকের ভিতর একটা যন্ত্রণাক্ত নিঃশ্বাস হাঁসফাঁস করে।—আপনার বাবার কি কোন চাকরি নেই?

অবন্তী—না, এখন তিনি সামান্য কয়েকটা টাকা পেনসন পান। রোগে শয্যাশায়ী। মা আজ তিন বছর হলো যক্ষ্মা হাসপাতালের বিছানাতেই শেষবারের মত চোখ বুঁজে চলে গিয়েছেন। আর. বাবা তাঁর সর্বস্ব বেচে দিয়ে আমাদের এতদিন বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আর না। আর তাঁর সম্বল নেই, শক্তিও নেই।

অবন্তী সরকারের জীবনের দুঃখের যন্ত্রণা শুনে শেখরের বুকের ভিতরে একটা করুণ বিদ্রূপ নীরবে হেসে ওঠে। এ আর কি-এমন নতুন কথা বলছে অবন্তী সবকার? ঐ-সব দুঃখ যে শেখর মিত্রের বুকের পাঁজরে পাঁজরে চেনা। শেখর মিত্রের জীবনটাকে একটুও চেনেনা, কোন খবরও রাখে না অবন্তী সরকার, তাই অনায়াসে তার নিজের জীবনের বেদনাগুলিকেই সংসারের সব চেয়ে বড় দুঃখের ইতিহাস বলে মনে করে একজন অপরিচিতের কাছে বর্ণনা করতে পারছে।

দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকায় শেখর। অবন্তী সরকারও তাকায়। একটা বাজতে আর এক মিনিট মাত্র। বোধ হয় কোন কথা বলবার জন্য মনে মনে তৈরী হতে থাকে শেখর, কিন্তু অবন্তী সোফা থেকে উঠে এসে সোজা শেখরের একেবারে কাছে এসে আস্তে আস্তে বলে—আপনি অনুগ্রহ করুন।

অবন্তী সরকারের চোখের কোণে ছোট একটা জলের ফোঁটা চিকচিক করছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে শেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বিব্রত হয়ে, ভয় পেয়ে, আশ্চর্য হয়ে, আর সারা মুখটা বেতনার্ত করে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় শেখর—এ কি বলছেন আপনি ?

অবন্তী—ঠিকই বলছি। আপনার যা কোয়ালিফিকেশন, তাতে আপনি এর চেয়ে অনেক ভাল সার্ভিস পেতে পারেন। কিন্তু আমার পক্ষে এর চেয়ে ভাল সার্ভিস আশা করা দুরাশা।

শেখর - কিন্তু, আমি কি করতে পারি ?

অবন্তী—আপনি যদি ইণ্টারভিউ না দেন, এখনি চলে যান, তবে আশা আছে আমিই কাজটা পেয়ে যাব। কারণ, আর কোন ক্যানডিডেট নেই।

শেখরের মনের ভিতর যেন বিচিত্র এক বেদনার উষ্ণ বাতাস ছটফট করতে থাকে। পৃথিবীর একটি মানুষের অদৃষ্ট আজ করুণভাবে শেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ইচ্ছে করলেই শেখর আজ এই মুহূর্তে অবন্তী সরকারের ঐ বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে। চেষ্টা করলেই শেখর আজ অবন্তী সরকার নামে এক নারীর দীনতাদীর্ণ গৃহনীড়ের সব উদ্বেগ দূর করে দিতে পারে। জীবনে এই প্রথম একটা মানুষের উপকার করবার ক্ষমতা পেয়েছে শেখর। একটা মানুষকে সুখী করবার অধিকার ; একটা মানুষের জীবনের আশার আবেদন ধন্য করে দেবার মত সৌভাগ্যের অহংকার।

অবন্তী বলে —কাজটা যদি না পাই, তবে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবার মুখের দিকে আমি কি করে যে তাকাবো, বুঝতে পারবেন না শেখরবাবু। বাবা যদি কেঁদে ফেলেন, কি করে সহ্যই বা করবো বলুন ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে অবন্তী সরকারের আবেদন শুনতে থাকে শেখর। বুঝতে পারে শেখর, হ্যাঁ ঠিকই, অবন্তী সরকারের বাবার চোখ ঠিক

অনাদি মিত্র নামে আর একজন বৃদ্ধের চোখের মতই ছলছল করে উঠবে। জানে না অবন্তী সরকার, টালিগঞ্জের এক গলির ভিতরে ক্ষুদ্র একটি গৃহ যে মুহূর্তে শুনতে পাবে যে, চাকরি না পেয়ে শূন্য হয়ে ফিরে এসেছে শেখর, সেই মুহূর্তে সেই গৃহের চারটি মানুষের প্রাণে হতাশার পাঁজরভাঙা আঘাতের বেদনা শিউরে উঠবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, যাই হোক না কেন, যে-ই এই কাজটা পেয়ে যাক না কেন, অবন্তী সরকার অথবা শেখর মিত্র, উভয়ের মধ্যে যারই সৌভাগ্য আজ প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, এই পৃথিবীর কোন না কোন ঘরের প্রাণকে কাঁদতে হবে। অবন্তী বলে—আপনি আমাকে নিশ্চয়ই খুবই স্বার্থপর আর ছোট মনের মানুষ বলে মনে করছেন শেখরবাবু। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন। যদি আপনার বাড়ির অবস্থা আমার বাড়ির অবস্থার মত হতো, আর আমি আপনার চেয়ে বেশি যোগ্য ক্যানডিডেট হতাম, তাহলে আজ আপনি কি···।

চেঁচিয়ে ওঠে শেখর—না, কখ্খনো না। আমি তবুও আপনার কাছে এরকম অদ্ভুত অনুরোধ করে বসতাম না।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে, এতক্ষণের এত মুখরতার সব শক্তি হারিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকে অবন্তী সরকার। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকায় শেখর। থর থর করে কেঁপে ওঠে শেখরের দৃষ্টি। ঠিক একটা বেজেছে।

আর এক মুহূর্তও বাকি নেই। এই মাত্র, হয়তো কেরানিবাবু কিংবা চাপরাসি এসে হাঁক দেবে। জেনারেল ম্যানেজারের আহ্বান এসে পড়বে। ঐ আহ্বানের পরিণামে, আর কয়েকটি মিনিটের মধ্যে এই পৃথিবীর একটি দুঃখী সংসার সুখী হয়ে যাবে, এবং আর একটি দুঃখী সংসার আরও দুঃখী হয়ে যাবে।

একটা আর্ত দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ টেনে লিফট উপরে উঠে এসেছে। দু'জন আগন্তুক লিফ্টের খাঁচা থেকে বের হয়ে হন্তদন্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেল। লিফটের ভিতরে অনেক জায়গা। এখনি নীচে নেমে যাবে ঐ লোহার দোলনা। খাঁচা বন্ধ করবার জন্য হাত তুলেছে লিফটম্যান।

লিফটের দিকে ছুটে চলে যায় শেখর। শেখরের চোখের দৃষ্টিটা উতলা, মুখটা করুণ, যেন নিজেরই ইচ্ছার নাগাল থেকে পালিয়ে যাওয়া একটা অসহায়ের মূর্তি। একটা লাফ দিয়ে, নিজেরই বুকের একটা নিষ্ঠুরতাকে ভয় পেয়ে, লিফটের খাঁচার ভিতর ঢুকে পড়ে নিজেকে যেন রুদ্ধ করে শেখর।

টালিগঞ্জের গলির ভিতর সেই ক্ষুদ্র গৃহের দরজা আর জানালার কাছে এখন আশাদীপ্ত কতগুলি চক্ষুর দৃষ্টি আকুল হয়ে আছে। শেখরের পায়ের শব্দ শোনবার জন্য বাড়িটা উৎকর্ণ হয়ে আছে। বার বার সেই একই দৃশ্য মনে পড়ে। টালিগঞ্জের গলির একটি ক্ষুদ্র বাড়ির প্রকাণ্ড লোভের আর আশার স্বপ্নটার দৃশ্য। চেষ্টা করেও আনমনা হতে পারে না শেখর।

কিন্তু এখনই সেই উজ্জ্বল চোখগুলির সামনে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। পথে পথে ঘুরে আর পার্কের বেঞ্চিতে বসে কয়েকটি ঘণ্টার মত সময় পার করে দিতে হবে। বিকেল হোক, সন্ধ্যা পার হয়ে যাক, রাতটাও একটু গভীর হোক, অপেক্ষায় থেকে থেকে দীপ্তিহীন হয়ে যাক টালিগঞ্জের গলির সেই ঘরের চারটি মানুষের চার জোড়া চোখ। মধু বিধু ঘুমিয়ে পড়ুক। দেরি দেখে বাবা আর মা আগেই বুঝে ফেলুক যে, তাদের গীতাপাঠ আর কালীঘাটের পূজা ব্যর্থ হয়েছে।

আবার একটা আর্ত দীর্ঘশ্বাসের মত একটানা শব্দ। নীচে নেমে গেল লিফট।

চার

সত্যিই যে অনেক রাত হলো। শেখর এখনও ফিরছে না কেন? অনাদিবাবুর প্রশ্নের মধ্যে শুধু সন্দেহ নয়, একেবারে স্পষ্ট হতাশার আক্ষেপও যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। পিঠের ব্যথা এইবার বেশ জোর করে উঠেছে। আর ভুলে থাকবার শক্তি পাচ্ছেন

না অনাদিবাবু।

বিকেল হবার আগেই বড়দার জন্যে পাঁউরুটি কিনে এনেছিল মধু আর বিধু। তাছাড়া সুজির হালুয়া তৈরি করে রেখেছেন বিভাময়ী। বিকেল হতেই তো ফিরে আসবে শেখর। ক্লান্ত ছেলেটা যেন বাড়ি ফিরেই কিছু মুখে দিতে পারে, ব্যবস্থা করে রাখতে কোন ভুল করেন নি বিভাময়ী।

লক্ষ্মীঘটের আমপাতার উপর থেকে সেই প্রজাপতিটা কখন পালিয়ে গেল কে জানে? বিকেল পর্যন্ত ঠিক ওখানেই বসে ছিল। বিভাময়ী বলেন, কে জানে, ছেলেটা এত রাত করছে কেন বুঝতে পারছি না।

বিছানার উপর কাঁথার আড়াল থেকে হঠাৎ জাগা-চোখ বের করে বিধু প্রশ্ন করে—বড়দা ফিরেছে মা?

বিভাময়ী—না। তোরা ঘুমো।

বুকের বাঁ পাশে হাত বুলিয়ে অনাদিবাবু একবার দেয়ালের একটা তাকের দিকে তাকান, যেখানে নিঃশব্দে পড়ে আছে তাঁর জীবনের অনেক প্রিয় সেই বইটা, সেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। অনাদিবাবুর চোখের চাহনির ভঙ্গীটাও অদ্ভুত। যেন তাকের উপর রাখা একটা বাজে আবর্জনার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিভাময়ীর গায়ের জ্বর একটুও কমেনি। বেড়েছে কিনা তাও বোধ হয় বুঝতে পারেন না। শুধু বুঝতে পারেন, পা দুটো বড় বেশি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, কনকন করছে।

অনাদিবাবু বলেন—যা কপালে ছিল তাই হয়েছে বিভা।

বিভাময়ী—কি?

অনাদিবাবু—শেখরের চাকরি হয়নি।

কোন উত্তর দেন না বিভাময়ী। জ্বরের শরীরটা শুধু একবার সিরসির করে ওঠে। তার পরেই আঁচল তুলে চোখ মোছেন বিভাময়ী।

ধড়ফড় করে বিছানার উপরেই শায়িত শরীরটাকে কাত করে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু—তুমি কি সত্যিই ভগবানে বিশ্বাস কর বিভা?

বিভাময়ী—বিশ্বাস না করে উপায় কি ?
অনাদিবাবু—তার মানে ?
বিভাময়ী—ভগবান যদি না থাকে, তবে মানুষকে মিছামিছি এত ভয়ানক দুঃখটা দেবে আর কে বল ?
অনাদিবাবু—ছিঃ, তাকে কি ভগবান বলে ?
বিভাময়ী—জানি না।
আবার চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু—না জানলে চলবে কি ক'রে ? চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছ তো, কত চোর-ডাকাত মহাসুখে আছে, আর নিরীহ মানুষ জ্বলে পুড়ে মরছে। তবু ভগবানের উপর ভরসা যদি কর, তবে কোন কালেই কিছু হবে না।
বিভাময়ী—আর কারও ওপর ভরসা করি না।
এইবার একটু শান্তভাবে হাঁসফাঁস করেন অনাদিবাবু—তাই বল। অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকেন অনাদিবাবু। পিঠের ব্যথাটাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। বিভাময়ী প্রশ্ন করেন—ঘুমিয়ে পড়লে না কি ?
অনাদিবাবু—না।
বলতে বলতে উঠে বসেন অনাদিবাবু। তারপর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে, রুক্ষ ও শুষ্ক দৃষ্টিটাতে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে আবার বিড়বিড় করতে থাকেন—ভাবছি, কী অদ্ভুত দুর্ভাগ্য ! চোর-ডাকাত হবার মতও শক্তি আর নেই। বয়স হয়েছে, তার ওপর এই দুর্বল পাঁজরা।
বিভাময়ী উঠে দাঁড়ান। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে যান। অনাদিবাবুর একটা হাত ধরে বলেন—আশ্চর্য, তুমি আবার এসব কি বলছো ? তোমার মুখে এসব কথা সাজে না।
অনাদিবাবু—কেন সাজে না ?
না। চেঁচিয়ে ওঠেন বিভাময়ী। বিভাময়ীর গায়ের সব জ্বরের জ্বালা যেন তাঁর চোখের উপর গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। চোখ দুটো অদ্ভুতভাবে জ্বলে উঠেছে।

অনাদিবাবু বলেন—কি হলো? তুমি কার ওপর রাগ করছো?

বিভাময়ী—রাগ করে নয়, গর্ব করে বলছি, তোমাকে চোর ডাকাত করবার সাধ্যি ভগবানেরও নেই।

গর্ব? ঠিকই তো। অনাদিবাবুর মনে হয়, সত্যি কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বিভা। এত অভাব, এত দুঃখ, এত ক্লেশ, তবু আজও এই বাড়িটা ভণ্ড কপট চোর আর মিথ্যুক হয়ে যেতে পারেনি। দুঃখ-অভাব সহ্য করে করে শুধু নিজের প্রাণটাকেই ক্ষতাক্ত করেছে এই বাড়িটা, অন্য কারও সুখ লুঠ করতে চেষ্টা করেনি, পৃথিবীর কোন মানুষকে এক বিন্দু দুঃখ দেয়নি। ঐ শেখর, লেখা-পড়া শিখে এত বড়টি হয়েছে যে ছেলে, তাকে কখনও একটি মিথ্যা কথা বলতে শোনেননি অনাদিবাবু। আর ঐ মধু ও বিধু, রথের মেলার দিনেও একটি পয়সা পাওয়ার জন্য লোভী হয়ে কোন বায়না ধরে না ওরা। ছেলেমানুষ হয়েও কত শক্ত হয়ে গিয়েছে ওদের প্রাণ। এই তো ভাল, ঠিকই বলেছে বিভাময়ী। এক বেলা খেয়ে, কিংবা উপোস করে থেকেও এই গর্ব নিয়ে একদিন চোখ বন্ধ করতে পারা যাবে যে, ভাগ্য আর ভগবান এক সঙ্গে মিলেও পঁচাত্তর টাকা মাইনের একটা সামান্য মানুষকে চোর করতে পারেনি।

বাইরের দরজাটা শব্দ করে ওঠে। চমকে ওঠেন বিভাময়ী আর অনাদিবাবু।

হ্যাঁ, শেখরই এসেছে। আস্তে আস্তে হেঁটে এসে বারান্দার উপর উঠে জুতো খোলে শেখর। তারপর কলতলায় গিয়ে হাত-পা ও মুখ ধুয়ে ঘরের ভিতর এসে ঢোকে।

অনাদিবাবু স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করেন—মিছিমিছি এত দেরি করলি কেন রে?

গম্ভীর অথচ শুকনো স্বরে শেখর বলে—মিছিমিছি বলেই তো এত দেরি হলো।

বিভাময়ী—তার মানে, কাজটা হলো না?

শেখর—না।

মধু আর বিধু একসঙ্গে গায়ের কাঁথা ফেলে দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসে। দু'হাতে চোখ ঘষে, যেন ব্যর্থ স্বপ্নের মোহটাকে মুছে দিয়ে বড়দা'র মুখের দিকে তাকায়।

টালিগঞ্জের ক্ষুদ্র বাড়ির সব কৌতূহলের চরম অবসান এতক্ষণে হয়ে গেল। আর প্রশ্ন করে জানবার কিছু নেই। শেখরই বলে—আমার নিজেরই ভুলে কাজটা হলো না।

শেখরের কথার শব্দ শুনেও ঘরের প্রাণটা অচঞ্চল হয়ে থাকে। নীরব স্তব্ধ ও শান্ত। অনেকক্ষণ। তার পরেই বিভাময়ী বলেন—চল, খাবি চল।

শেখর বলে—খেতে পারবো না।

বিভাময়ী—কেন?

শেখর—ভাল লাগছে না।

শুধু মধু আর বিধু খেয়েছিল। অনাদিবাবু আর বিভাময়ী শেখরের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁদেরও যে খাওয়া হয়নি, সেটা শেখর জানে না, এবং জানলে বোধহয় অন্য কথা বলতো।

শেখর শুয়ে পড়তেই অনাদিবাবু আবার বিছানার উপর গড়িয়ে পড়েন এবং অসাড় শবের মত পড়ে থাকেন। বিভাময়ী ঘরের দরজা বন্ধ করে মেঝের উপর মাদুর পাতেন। তারপরেই বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েন! অন্ধকার ঘরের ভিতর শুধু কয়েকটা বড় বড় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কিছুক্ষণ ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাজতে থাকে। তার পরেই নিঝুম হয়ে যায় টালিগঞ্জের গলির ক্ষুদ্র বাড়ি। যেন দুঃসহ এক লজ্জার জ্বালায় মুখ লুকিয়ে আর উপোস করে নীরবে প্রায়শ্চিত্ত করছে কতগুলি অপরাধী জীবন।

পাঁচ

অবন্তী সরকারের বাবা নিবারণবাবু তাঁর পক্ষাঘাতের দুঃখ ভুলে গিয়ে এক হাতে ভর দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসতে চেষ্টা করেন

এবং সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন—ভগবান আছেন, সত্যিই ভগবান আছেন অবন্তী।

অবন্তী হাসে—তোমার কি কোনদিন সন্দেহ হয়েছিল?

নিবারণবাবু—হয়েছিল বৈকি। দুঃখ দুর্দশার জ্বালায় পড়ে খুবই সন্দেহ হয়েছিল অবন্তী। ভুল করে ভগবানের দয়াতেই অবিশ্বাস জন্মেছিল। কিন্তু ভগবানই আজ সেই ভুল ভেঙ্গে দিলেন।

এই বাড়িও একটা গলির মুখের কাছে ছোটখাট বাড়ি। কাশীপুরের গঙ্গা এই গলির কাছে দাঁড়িয়ে দেখা যায়। আজ সূর্য অস্ত যাবার আগে, গঙ্গার বুকের জলে যখন পশ্চিমের আকাশ থেকে রঙীন আভা ঝরে পড়েছে, তখন এই বাড়ির তিনটি কিশোর মানুষের কণ্ঠে জয়ধ্বনির মত একটা আনন্দের রব বেজে উঠেছে—দিদির চাকরি হয়েছে বাবা।

অবন্তী সরকারের চাকরি হয়েছে। অবন্তী সরকারের সঙ্গে আলাপ করে জেনারেল ম্যানেজার খুশি হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট-পত্রও দিয়েছেন। আগামী কাল সকাল দশটাতে অফিসে গিয়ে অবন্তী সরকার তার নতুন চাকরি-জীবনের যাত্রা সুরু করবে। মনে হয়, একটা অপার্থিব রঙীন আভা ঝরে পড়েছে কাশীপুরের গলির মুখে এই পার্থিব সংসারের এতদিনের যত দুঃখ ও দীনতার ধোঁয়া আর ধুলোর উপর। এক মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দীর্ঘদিনের দুঃসহ পীড়নে ক্লান্ত একঘর মানুষের বিষণ্ণ জীবন। নিবারণবাবু তাঁর জীবনের হারিয়ে যাওয়া সব চেয়ে প্রিয় বিশ্বাস হঠাৎ আবার মনের কাছে ফিরে পেয়েছেন। জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল, হাসবার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল যারা, সেই সব ছোট ছোট মানুষের চোখেও—হারু চারু আর নরুর চোখে যেন নতুন সূর্যোদয়ের আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এত কলরব।

দরজার বাইরে একটা ভিখারী এসে দাঁড়িয়ে কর্কশ স্বরে কৃষ্ণনাম গাইতে শুরু করেছে। আজ তাকে ধমক দিতে ভুলে গেলেন

নিবারণবাবু। আর, চারু দৌড় দিয়ে বাইরে গিয়ে ভিখারীটার ঝুলিতে এক বাটি চাল ফেলে দিয়ে চলে আসে।

অবন্তী বলে—আর এই বাড়িতে নয় বাবা।

হ্যাঁ, এটা ভাড়া বাড়ি। মাসে ত্রিশ টাকা ভাড়া, এবং সেই ভাড়া নিয়মমত ও যথাসময়ে দিতে না পারায় বছরের পর বছর বাড়িওয়ালার কথা আর আচরণে যে অপমান সইতে হয়েছে, সেই অপমানের জ্বালাকেই অপমান করবার জন্য অবন্তী সরকারের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে।

অবন্তী বলে—পার্ক সার্কাসে একটা নতুন বাড়িতে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট খালি আছে, একশো টাকা ভাড়া।

নিবারণবাবু বলেন—বেশ, সেখানেই উঠে যাওয়া যাক।

অবন্তী বলে—চৌরঙ্গিতে একটা বড় দোকান আছে, ফার্নিচার সাপ্লাই করে। দাম কিস্তিতে নেয়।

চারু আর হারু একসঙ্গে চেঁচায়—আমাদের জন্যে একটা নতুন টেবিল।

নরু বলে—আমার জন্য একটা ক্যারম বোর্ড।

নিবারণবাবু—বেশ তো, ঘর সাজাবার জন্য যা যা দরকার, তা ছাড়া কিছু কিছু কাজের জিনিসও কিনে ফেলতে পারলে ভালই হয়।

চারু আর হারু বলে—একটা রেডিও না হলে ভাল লাগে না দিদি।

অবাধ হাওয়ার ঝড়ের মত ইচ্ছাগুলি যেন হু হু করে ছুটে আসছে। যেমন প্রৌঢ় নিবারণবাবু, তেমনি প্রায়শিশু নরু, সবারই জীবনের দাবি একসঙ্গে মুখর হয়ে উঠতে চাইছে। মুখর হয়ে উঠতে ভাল লাগছে। অবন্তী সরকারের দু'চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যেও যেন একটা স্বপ্নময় নিবিড়তা। ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে, এবং সেই প্রসন্নতাকে একেবারে মনে-প্রাণে আপন করে নিতে হবে।

ভাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে অবন্তী সরকার হেসে ওঠে।—আজ একটা পিকনিক করলে কেমন হয়?

চারু—খুব ভাল হয় দিদি।

নিবারণবাবু বিছানার উপর কাত হয়ে বসে হাসতে থাকেন।—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে অবন্তী। আজ আর কোথায় গিয়ে পিকনিক করবি?

চারু আর হারু বলে—ছাদের ওপরে।

টাকা বের করে চারুর হাতে দিয়ে হাসতে থাকে অবন্তী—লুচি, চিংড়ি-কপি আর পায়েস হোক, কেমন?

উল্লাসে লাফিয়ে আর উৎফুল্ল ভাবে চেঁচিয়ে বাজার করবার জন্য ছুটে বের হয়ে যায় চারু আর হারু।

কাশীপুরের গলির মুখে ছোট একটা বাড়ির জীবনে সুখের প্রতিষ্ঠার উৎসব সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত গল্পে হাস্যে আর কলরবে মুখর হয়ে উঠতে থাকে। নিবারণবাবু বিছানার উপর কাত হয়ে শুয়ে শুয়েই চারটি গান গাইলেন। তাঁর জীবনের অনেক দিনের আগের প্রিয় ভজনগুলি যেন ভাঙ্গা সেতারের মত তাঁর মনের ঘরের এক কোণে ধুলোয় ঢাকা হয়ে পড়েছিল। রোগ আর অভাব এক সঙ্গে মিলে নিবারণবাবুর গলা রুদ্ধ করে রেখেছিল। কিংবা এমনও হতে পারে যে, নিবারণবাবুর গলা ঐ সব ভজনের অসার আশ্বাসগুলিকে ঘৃণা করে এবং ইচ্ছে করেই নীরব করে রেখেছিল। আজ হঠাৎ ভুল ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই গলা খুলে চার চারটে গান গাইতে পারলেন নিবারণরাবু।

রাত যখন নিঝুম হয়, নিবারণবাবু যখন পায়েস আর কোকো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, এবং হারু চারু ও নরু বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে ঘুমন্ত চোখে নতুন নতুন অঢেল স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, তখন অবন্তী সরকারের আত্মাটা যেন একটু একলা হবার সুযোগ পায়।

আরও অনেকক্ষণ জেগে বসে থাকে অবন্তী। গঙ্গার ঘাটে মোটর বোটের কোন শব্দ শোনা যায় না। ঘুমন্ত ঘরের দেয়ালে আয়নাটার উপর অবন্তী সরকারের মুখের ছবি ভাসে। সত্যিই, অবন্তী এতক্ষণ পরে একলাটি হয়ে নিজেকে এইবার বড় স্পষ্ট দেখতে পায়। নিজের মুখের ঐ ছবিটিকেই দেখতে আজ নতুন করে ভাল লাগে, কারণ ছবিটি দেখতে খুবই সুন্দর। স্নো, রুজ পাউডার আর

লিপস্টিকের ধার ধারে না অবন্তী। কিন্তু অবন্তী জানে, এবং আজ আরও ভাল করে দেখতেই পায়, অবন্তীর ঐ দুই চোখের মধ্যেই কাজলমাখা একটা ছায়া-ছায়া কালো আপনি ফুটে রয়েছে। কাজলের দরকার হয় না। ঠোঁট দুটিও যে আপন রক্তের গর্বে রঙীন হয়ে আছে। লিপস্টিকের দরকার হয় না। রুমাল দিয়ে আস্তে একটু ঘষা দিলেই সারা মুখটা ঝকঝক করে ওঠে, স্নো ঘষবার কোন দরকার নেই।

আস্তে আস্তে খোঁপার বাঁধন খোলে অবন্তী। সে বাঁধনেও বিশেষ কোন স্টাইলের ছাঁদ ছিল না। দরকার কি? নরম নরম রেশমের স্তবকের মত ঐ এক রাশ কালো চুলের বোঝাকে সামান্য একটু চিরুনি বুলিয়ে ছেড়ে দিলে, কিংবা তিনপাক দিয়ে গুটিয়ে ঘাড়ের উপর তুলে দিলেই তো যথেষ্ট।

একেবারে সাদা প্লেন শাড়ি। সরু পাড়ের রেখা চোখেই পড়ে না। সে পাড়ের রং আছে কিনা, তাও বোঝা যায় না। আজ যে শাড়িটা পরে চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিল অবন্তী, সে শাড়িটা একটা সাদা ভয়েল, পাড়টা ক্রিম রং-এর সরু লেস। এই সাদাটে সাজের মধ্যে অবন্তী সরকারের কালো চোখ আর এলোমেলো খোঁপার কালো স্তবক অদ্ভুত এক রূপের অভিমান নিবিড় করে তোলে। গলায় হার নেই, কানে কিংবা হাতেও কিছু নেই, অবন্তীর সেই মূর্তির মধ্যে অদ্ভুত একটা সাদাটে গর্ব যেন কঠোর মার্বেলের মত হাসে। অবন্তীও জানে, তার ঐ রূপের দিকে যার চোখ পড়ে, তারই চোখে যেন একটা লোভের বিস্ময় চমকে ওঠে। যে হঠাৎ তাকায় সে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। অবন্তী সে-সব চোখের দৃষ্টিকে কোন দিন মনের ভুলেও শ্রদ্ধা করতে পারেনি। বরং, মনে মনে নিজেই একটা অস্বস্তিকর লজ্জার বেদনা অনুভব করেছে। পৃথিবীর এই সব হতভম্ব বিস্মিত আর লোভী চোখগুলি যেন কতগুলি বিদ্রূপ। ওরকমের চোখ নিয়ে অবন্তীকে চিনতে পারা যায় না।

ঐসব দৃষ্টি কোন নারীর জীবনের সম্মান নয়। ঐসব দৃষ্টিকে ঘৃণা করতেই বরং ভাল লাগে।

জীবনে শুধু একজনের চোখের বিস্মিত দৃষ্টিকে ঘৃণা করতে পারেনি অবন্তী। ঘৃণা করা দূরে থাকুক, মনে-প্রাণে ভালই লেগেছে, এবং বার বার সেই ছুটি চোখেরই দৃষ্টিকে চোখের কাছে দেখতে ইচ্ছা করে। নিখিলের চোখের মধ্যে যেন অদ্ভুত একটা কৃতজ্ঞতার বিস্ময় সব সময় জ্বলজ্বল করে। কারণ, নিখিলের চোখের সেই বিস্ময় যে অবন্তীরই জীবনের সম্মান গর্ব আর অভিনন্দন। নিখিল কাছে এসে দাঁড়ালেই মনে হয় অবন্তীর, সে তার ভালবাসার ভাগ্যকেও নিজের হাতে গড়ে তুলতে পারছে।

টাকা-পয়সা দিয়ে তৈরী অদৃষ্টটা অবন্তীকে গরীব করে দিয়ে অবন্তীর জীবনের প্রথম ভালবাসার ইচ্ছাটাকেই ভয় দেখিয়ে দমিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই অদৃষ্টকেও নিজের জেদের জোরে তুচ্ছ করেছে অবন্তী। গল্পে শোনা যায়, মানত সফল করবার জন্য অনেকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে ব্রত করে। অবন্তীর ভালবাসার কাণ্ডটাও প্রায় সেইরকম; অবন্তীর মত গরীব মেয়ের পক্ষে তার ভালবাসার মানুষের জন্য মাসে ত্রিশটা টাকা খরচ করা বুক চিরে রক্ত দিয়ে ব্রত করার চেয়েও কি কম কঠোর ব্রত?

নিখিলকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাবে না, অবন্তীর জীবনের সেই রিক্ততার চেয়ে ভয়ানক রিক্ততা আর কি হতে পারে? এই রিক্ততা কল্পনাতেও সহ্য করতে পারে না অবন্তী। বিশ্বাস করে অবন্তী, নিখিলের জন্য সে সবই করতে পারে। সে জন্য আগুনে ঝাঁপ দেবার মত ব্রত করবার যদি দরকার হয়, তা'ও করতে বোধ হয় এক মুহূর্তও দেরি করবে না অবন্তী। আজ মনে হয়, হ্যাঁ, সেই রকমই একটা ব্রত আজ পালন করতে পেরেছে অবন্তী। দরকার হয়েছিল এবং অন্য কোন উপায়ই যে ছিল না। একেবারে মাথা নীচু করে, চোখ ঝাপসা করে, আবেদন জানিয়ে, অভিমান করে এবং ইচ্ছে করেই এই কালো চোখের ছায়া-ছায়া নিবিড়তা আরও

নিবিড় করে একটা লোকের চোখের বিস্ময়কে লুভিয়ে দিয়ে, এবং লোকটার পাথুরে আপত্তিকে অনেক চেষ্টায় গলিয়ে দিয়ে অবন্তী তার মন তো আজ সফল করতে পেরেছে। আজও ভাগ্যটা অবন্তীকে ঠকাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অবন্তী সত্যিই, শুধু একটা সুন্দর অভিনয়ের জোরে সেই ভাগ্যকেই ছলিয়ে ভুলিয়ে আর নিজে জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। নিজেকে ওভাবে ছোট করতে গিয়ে অবন্তীর এত দিনের এত প্রিয় অহংকারের গায়ে একটা আগুনের জ্বালাও লেগেছিল। কিন্তু সে জ্বালাকেও তুচ্ছ করেছে অবন্তী। নিখিলের জন্য সবই করতে পারে অবন্তী।

কানপুরে চলে যাবার দুঃখ থেকে নিখিলকে বাঁচাতে পেরেছে অবন্তী। নিখিল এখন কলকাতাতেই থেকে ভাল চাকরির চেষ্টা করতে পারবে। নিখিলের হাতে প্রতি মাসে এক'শো টাকা তুলে দিতেও অবন্তীর কোন অসুবিধা নেই। সে সুযোগ, সে শক্তি নিজেই আজ অর্জন ক'রেছে অবন্তী।

এতদিনে অবন্তীর জীবনের সেই জেদের তপস্যা সফল হয়েছে। নিজের হাতে নিজের ভাগ্য গড়বার আশা এইবার একেবারে উপহার হাতে নিয়ে দেখা দিয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলতে খুলতে জীবনের এই সফল গর্বের আনন্দকেই যেন দুচোখে ধারণ করে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে অবন্তী।

আর একটা আনন্দ। কালই সকালে এই শুভ খবর শুনে কত খুশি হয়ে উঠবে সেই মানুষটি, যার নাম নিখিল মজুমদার! পৃথিবীর মধ্যে এই তো একমাত্র মানুষ, যার মুখ থেকে আজ এক বছর ধরে ভালবাসার কথা শুনে আসছে অবন্তী। পৃথিবীর কোন ধূর্ত ও সজাগ চক্ষুও আজ পর্যন্ত বুঝে ফেলবার সুযোগ পায়নি যে, অবন্তী সরকার ঐ নিখিল মজুমদারের গরীব ভাগ্যটাকেও সুখী করবার জন্য প্রাণপণে একটা ভাল চাকরি খুঁজছে।

আজকের আনন্দের মধ্যে আরও অনেক কথাই মনে পড়ে। অবন্তীরই মুখ থেকে যে আশ্বাস পেয়ে মুগ্ধ হয়ে আছে নিখিলের

মন, এবং যে আশ্বাসের প্রেরণায় প্রাণপণে একটা ভাল চাকরি খুঁজছে নিখিল। সেই আশ্বাসের ভাষাও যেন অবন্তীর এই সুখী ভাবনার নিভৃতে নীরবে গুঞ্জন করে।

যেমন করেই হোক, আগে অবস্থার উন্নতি করে নিতে হয় নিখিল। আমি চাই, যেমন আমার তেমনই তোমার অবস্থা আগে স্বচ্ছল হোক, নইলে, অভাব আর কষ্টের মধ্যে বিয়ের উৎসবও বড় কষ্টের মনে হবে নিখিল।

খুব সত্যি কথা! নিখিলও স্বীকার করে। দু'জনেই রোজগার করবে, কেউ কারও কাছে ভাতকাপড়ের প্রার্থী হয়ে থাকবে না, অথচ একই ভালবাসার ঘরে দু'জনে থাকবে।

গঙ্গার ঘাটের দিক থেকে ফুরফুরে বাতাস ভেসে আসছে। ভোরের বাতাস নাকি? এতক্ষণে বুঝতে পারে অবন্তী, শরীরটা বেশ ক্লান্ত হয়েছে। চোখ দুটোও নিঝুম হয়ে আসছে। কাল সকালে উঠেই প্রস্তুত হতে হবে। সৌভাগ্যের পথে প্রথম যাত্রা শুরু হবে। বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে অবন্তী সরকার।

প্রথম তন্দ্রার মধ্যে আবছায়ার মত একটা স্মৃতির ছবি হঠাৎ একবার যেন অবন্তীর চোখের উপর দিয়ে ছায়া বুলিয়ে দিয়ে চলে যায়। বড় বড় কয়েকটা সোফা, প্রকাণ্ড একটা নোটিস বোর্ড, দরজার গায়ে ঝকঝকে পিতলের নেমপ্লেট আর দেয়ালের গায়ে ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে। এক ভদ্রলোক অবন্তী সরকারের মুখের দিকে হঠাৎ একবার অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে লিফটের দিকে ছুটে চলে গেলেন। কি যেন সেই ভদ্রলোকের নাম? অনসূয়ার বৌদি প্রভার দাদা হন সেই ভদ্রলোক। হ্যাঁ, অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চোখ দুটোও বার বার বড় বিশ্রী রকমের মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল। তন্দ্রার মধ্যেই হেসে ফেলতে চেষ্টা করে অবন্তী।

ছয়

টালিগঞ্জের গলির ভিতর ক্ষুদ্র একটা বাড়ির উঠানে পেঁপে গাছের ডালে বসে সকাল বেলায় কাক বড় বিশ্রী ডাক ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় আরও বিশ্রী শব্দ করে একটা আঘাত বাজতে থাকে। প্রচণ্ড ভাবে কড়া নাড়ার কর্কশ শব্দ। বুঝতে পারে শেখর, বাড়িওয়ালার দারোয়ান ভাড়ার তাগিদ দিতে এসেছে।

বিছানার উপর বসে অনাদিবাবুও হাঁক দেন ; সেই হাঁকের স্বরও আর এক রকমের কর্কশতায় বিশ্রী হয়ে বেজে ওঠে—ওহে সুযোগ্য ছেলে, শুনতে পাচ্ছ ?

শুনতে পেয়েছে, এবং বুঝতেও পেরেছে শেখর। অনাদিবাবু আজকের সকালের এই প্রথম সম্ভাষণেই শেখর নামে তাঁর এক অতিশিক্ষিত ছেলের অপদার্থ জীবনটাকেই আক্রমণ করেছেন। বাড়িওয়ালার দারোয়ান বুড়ো বাপকে অপমান করতে এসেছে, এবং ত্রিশ বছর বয়সের ছেলে ঘরের ভিতর চুপ করে বসে সেই অপমানের কর্কশ শব্দ শুনছে। জীবনে এর চেয়ে বেশি ঘৃণার ব্যাপার আর কি হতে পারে ?

এখনও মেঝেয় মাদুরের উপর পড়ে আছেন বিভাময়ী। কাল সকালে কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে যাওয়া-আসা করতে হয়েছিল। কোমরে মচকানির মত একটা ব্যথা ধরেছিল। তারই জের চলছে। সকাল হয়ে গেলেও এবং ঘুম ভেঙ্গে গেলেও আজ আর উঠতে পারছেন না।

মধু আর বিধু কাঁথা মুড়ি দিয়ে দুটো পুঁটলির মত পড়ে আছে। আজ আর জেগে উঠবার কোন তাড়া নেই। কিন্তু জেগে উঠতে হলো। অনাদিবাবু আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন—লজ্জা পাওয়া উচিত। মান-সম্মান বোধ থাকলে তুমি এতক্ষণ ওভাবে বসে থাকতে পারতে না। রোজগার করতে না পার, চুরি-ডাকাতি করতে তো পার।

বিভাময়ী উঠে বসে আর্তনাদ করেন—ভগবান!

অনাদিবাবু—রাখ তোমার ভগবান। ভগবানের এমনই দয়া যে, শিক্ষিত ছেলে ত্রিশ বছর বয়স পার করে দিয়েও একটা পয়সা রোজগারের সামর্থ্য পেল না।

শেখর বলে—মধু, একবার বাইরে যা তো।

মধু—কেন?

শেখর—যদি বাড়িওয়ালার দারোয়ান এসে থাকে, তবে…।

মধু—তুমি গিয়ে দেখে এস। আমার ভয় করে।

শেখর হাসে। তার পরেই উঠে দাঁড়ায়, দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বাড়িওয়ালার দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে। চলে যায় দারোয়ান। অনাদিবাবুর গলার স্বরের উত্তাপ শান্ত হয় না। বিভাময়ীর দিকে তাকিয়ে সেইরকমই কর্কশ স্বরে আর একটা নির্দেশ ঘোষণা করেন—আজ আর যেন উনুনে আগুন না দেওয়া হয়। কোন দরকার নেই। উপোস করে সবাই শেষ হয়ে যাও, এই আমি চাই।

উনুনে আগুন দেবার দরকার আছে ঠিকই। কিন্তু বিভাময়ী জানেন, আগুন দিয়েও কোন লাভ নেই। কারণ, তারপর যা দরকার হবে, তার কোন চিহ্ন নেই ভাঁড়ারে। না চাল, না ডাল। দুর্দশাটা একেবারে নিখুঁত হয়ে এই সংসারটাকে সব কাজের দায় থেকে আজ একেবারে মুক্ত করে দিয়েছে।

অনাদিবাবু চিৎকার করেন—সুযোগ্য ছেলেকে বলে দাও বিভা, ভাঁড়ার ঘরের ভিতরে বসে যেন ধ্যান করে। তা হলেই কর্তব্য পালন করা হয়ে যাবে।

শেখর মিত্রের মনের উপর যেন একটা চাবুক আছড়ে পড়েছে, মুখটা হঠাৎ লালচে হয়ে ওঠে। কিন্তু ছটফট করে না শেখর। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরের ভিতরে ঢোকে। তার পরেই চটি পায়ে দিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে গলির পথে দাঁড়ায় বিধু একটা লাফ দিয়ে উঠে দরজা দিয়ে উঁকি দেয়। তার পরেই

চেঁচিয়ে ওঠে—দাদা কোথায় চলে গেল মা।
অনাদিবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—যাক, চলে যাক। তাই ভাল। তোরাও চলে যা! আমাকে মরবার আগে একটু হালকা হতে দে।
পেঁপে গাছের কাকটা অনেকক্ষণ ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে এবং বোধ হয় কলতলার দিকে তাকিয়ে একটু হতাশ হয়ে চলে গিয়েছে। বিভাময়ী উঠলেন। স্নান করলেন। এবং লক্ষ্মী-ঘট তুলে নিয়ে গিয়ে তুলসীতলায় জল ঢেলে দিয়ে আবার নতুন জল ভরে ঘরের ভিতর ফিরে এলেন।
অনাদিবাবুর চোখে ভ্রূকুটি দেখা দেয়। আস্তে আস্তে বিড় বিড় করেন—অসহ্য! তোমার কাণ্ডও অসহ্য।
বিভাময়ী—কি বললে?
অনাদিবাবু—ঐ লক্ষ্মী-ঘট এইবার সিকেয় তুলে রেখে দাও। আমি মরবার পর যখন সৌভাগ্যে সোনার সংসার জমে উঠবে, তখন আবার নামিয়ে এনে পুজো করো। অনেক হয়েছে, এবার একটু ক্ষান্তি দাও।
বিভাময়ী যেন শুনতে পাননি, কিংবা শুনেও বিচলিত হননি। কিংবা অদ্ভুত এক নির্বিকার অহংকার নিয়ে এই সংসারের সব দুর্ভাগ্যকেই তুচ্ছ করতে চাইছেন। তাই, যেমন রোজ সকালে তেমনই আজও সকালে ঘরের কোণে লক্ষ্মী-ঘট রাখলেন। তারপর বিধুর দিকে তাকিয়ে বললেন—মল্লিকবাবুদের বাগান থেকে আমপাতা নিয়ে আয় তো বাবা।
বিধু বলে—আমি পারবো না। মধু তুই যা।
মধু—আমিও পারবো না। আমি কাল নিয়ে এসেছি। তাছাড়া আমার ওসব আর ভাল লাগে না।
বিভাময়ী—ভাল লাগে না মানে কি রে?
মধু—ওতে কিচ্ছু হয় না। একেবারে মিছিমিছি, শুধু সময় নষ্ট।
আর কোন কথা বলেন না বিভাময়ী। জ্বরের গায়ের উপর আঁচল ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যান। খুব

কাছে নয় মল্লিকবাবুদের বাগান। হেঁটে যেতে কষ্টও হচ্ছে। তবুও কয়েকটা আমপাতা এনে লক্ষ্মী-ঘটের চেহারা সাজাতেই হবে।

অনাদিবাবু বলেন—আশ্চর্য, তবু শিক্ষা হয় না। মানুষও মিছিমিছি নিজের জীবনকে এমন করে ঠকাতে পারে?

মধু আর বিধু ঘরের বাইরে গিয়ে গলির রোদের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনাদিবাবুও উঠলেন, আর এভাবে পড়ে না থেকে অফিসে চলে যাওয়াই ভাল। যে ঘরে আজ উনন জ্বলবে না, হাঁড়ি চড়বে না, দুটো ছোট ছেলেও উপোস করে থাকবে, সেই ঘরকে লক্ষ্মী-ঘট দিয়ে সাজাবার কাজ ছাড়া আর কোন কাজ করবার উপায় নেই। বিদ্রূপ, কি ভয়ানক বিদ্রূপ!

বিছানা থেকে নেমে মুখ ধোওয়ার জন্য জলের ঘটি হাতের কাছে টেনে নিতেই অনাদিবাবুর বুকের ভিতরটা কনকন করে ওঠে। নিঃশ্বাসটা ফুঁপিয়ে ওঠে। চোখের কোণ থেকে টুপটাপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে। ব্যস্তভাবে ডাক দেন অনাদিবাবু—ওরে মধু, ওরে বিধু!

ডাক শুনে মধু আর বিধু ব্যস্ত হয় না। এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় মুখ গম্ভীর করে আস্তে আস্তে হেঁটে দু'জনে ঘরের ভিতরে ঢোকে।

অনাদিবাবু প্রশ্ন করেন—শেখর কি সত্যিই চলে গেল?

মধু—বড়দা অনেকক্ষণ হলো চলে গিয়েছে।

অনাদিবাবু—দেখ তো, কোন্ দিকে গেল?...আর বিধু, তুই একটু দেখ তো বাবা, তোর মা কোন্ দিকে গেল। মানুষটা কাল থেকে জ্বরে ভুগছে।

মধু আর বিধু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয়। চোখ ছল ছল করছে তারই, যে মানুষটা এই এক মিনিট আগেও কঠোর ভাবে সবাইকে সরে যেতে আর মরে যেতে বলেছিলেন।

মধু ভয়ে ভয়ে বলে—তুমি কাঁদছো কেন বাবা!

বিধু বলে—তুমি আজ আর অফিসে যেও না বাবা।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে, তারপর ব্যস্তভাবে চোখ মুছতে থাকেন

অনাদিবাবু, এবং শান্তভাবে বলেন—যাক গে, তোরা একটা কাজ কর। আমার চিঠি নিয়ে রাধানাথের দোকানে একবার যা। মনে হয়, পাঁচ টাকার মত বাজার ধারে দিতে রাজি হবে রাধানাথ।

এক টুকরো কাগজের উপর অনেক মিনতি জানিয়ে রাধানাথের কাছে প্রতিশ্রুতি লেখেন অনাদিবাবু, আগেকার বাকি তেইশ টাকা আসছে মাসের মাঝামাঝি নিশ্চয়ই শোধ করে দেবেন, আজ যেন অন্তত পাঁচ টাকার চাল-ডাল পাঠিয়ে দেয় রাধানাথ।

চিঠি হাতে নিয়ে মধু আর বিধু বাইরে যাবার জন্য তৈরী হতেই ঘরের দরজার কাছে হাঁক-ডাকের শব্দ শোনা যায়। ঘরে ঢোকে শেখর, সঙ্গে দুজন ঝাঁকা মুটে। ঝাঁকার উপর নানারকম ছোট বড় কাগজের ঠোঙ্গায় ভারি-ভারি সামগ্রী।

আস্তে হাঁপ ছেড়ে শেখর বলে—মা কোথায় গেল মধু?

বিধু বলে—এখুনি ডেকে আনছি।

অনাদিবাবু তেমনই শান্তভাবে বসে দেখতে থাকেন, এই নিরন্ন সংসারের ক্ষুধা মেটাবার জন্য যা প্রয়োজন, অন্তত এক মাসের মত যা প্রয়োজন, সবই নিয়ে এসেছে শেখর। ছোট এক কৌটা ঘি-ও আছে। ঝাঁকার জিনিস নামাতে নামাতে শেখরই অনাদিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে—তুমি তো পোস্ত খুব ভালবাস বাবা?

অনাদিবাবু—হ্যাঁ, কিন্তু এসব কি ব্যাপার শেখর?

শেখর—তোমার জন্য এক পো পোস্ত এনেছি।

বোধ হয় আবার অনাদিবাবুর দু'চোখে একটা তপ্ততা ছলছল করে উঠবে। বারান্দা থেকে উঠে ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে চলে যান। এ কি হলো? কোথা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে এসব কি নিয়ে এল শেখর? অযোগ্য ছেলেকে ভয়ানক কর্কশ ভাষায় ধিক্কার দিয়ে কিছুক্ষণ আগে চুরি-ডাকাতির গৌরব ঘোষণা করেছিলেন তিনি। তবে কি, সত্যিই কি অযোগ্য ছেলে সেই ধিক্কারের জ্বালায় একটা কাণ্ড করে বসলো? দেখা যায়, মস্ত বড় একটা প্যাকেটও নিজের হাতে বয়ে নিয়ে এসেছে শেখর। প্যাকেটের উপর একটা বস্ত্রালয়ের

নাম ছাপা রয়েছে। নিশ্চয় অনেকগুলি কাপড় জামার প্যাকেট এ কি হলো? বিড়বিড় করে বলতে বলতে থর থর করে কাঁপতে থাকেন অনাদিবাবু। শেখর যেন আজকের অভিশপ্ত এই সকালের ধোঁয়াভরা বাতাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে এই উপোসী সংসারটার জন্য এক গাদা খোরাক লুঠ করে নিয়ে এসেছে। সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু সন্দেহ না করেই বা উপায় কি? কোন চাকরি করে না, আজ পর্যন্ত কোন চাকরি পায়নি, এখন শুধু মস্ত বড় একটা কাজ পাওয়ার আশায় মন বড় করে ঘরে বসে আছে যে ছেলে, সে ছেলে টাকা পেল কোথায়?

শেখরকে শুধু একটা প্রশ্ন করলেই তো অনাদিবাবুর মনের এই সন্দেহ মিটে যায়। কিন্তু প্রশ্ন করবারই সাহস হয়না। কে জানে, কি উত্তর দেবে শেখর? যদি একটা ভয়ংকর উত্তর দিয়ে বসে, যদি সত্যিই বলে দেয় যে, চুরি করেছি, একটা ধাপ্পা দিয়ে এই বাজার নিয়ে এসেছি, খেয়ে খুশি হও তোমরা, তবে? তাহলে যে বলবারই আর কিছু থাকবে না।

অনাদিবাবুর দুর্বল মনের এই বিকার বোধ হয় খুব শিগগির শান্ত হতো না, যদি মধু তখন মহোল্লাসে ছুটে এসে একটা সুখবর না দিত। মধু বলে দাদা নিজে টাকা দিয়ে জিনিস কিনে নিয়ে এসেছে বাবা। দাদা একটা কাজ ধরেছে, তাই টাকা পেয়েছে।

সে কি রে শেখর? বলতে বলতে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন অনাদিবাবু।

অনাদিবাবুর বিস্মিত স্বরেব প্রশ্ন শুনে শেখর হাসে—একটা ছাত্রকে পড়াবার কাজ নিলাম। কাল থেকে পড়াতে হবে। ছাত্রের বাপের কাছ থেকে কিছু টাকা আগাম পেয়েছি।

অনাদিবাবুর মুখটা করুণ হয়ে ওঠে।—কিন্তু তুই যে বলেছিলি···।

শেখর—হ্যাঁ, কোনদিন ভাবিনি যে, এরকম ছাত্র পড়াবার কাজ নেবার দরকার হবে। কিন্তু···!

অনাদিবাবু—কিন্তু আমার কথায় বোধ হয় মন খারাপ করে···!

শেখর হাসে—না বাবা, আমি ইচ্ছে করে আর বেশ খুশি হয়ে এই কাজটা নিয়েছি। মাসে একশো টাকা পাওয়া যাবে।

দেখে মনে হয়, সত্যিই খুশি হয়েছে শেখর। ওর চোখে মুখে কোন অভিমানের ছাপ নেই। এত ভাল একটা চাকরি হতে হতেও হলো না, সে জন্য এপর্যন্ত একটা আক্ষেপও শেখরের কথার মধ্যে বেজে উঠতে শোনা গেল না। অথচ নিজেই স্বীকার করেছে যে, নিজেরই দোষে কাজটা হয়নি। অনাদিবাবু একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন—কাল যে চাকরিটার জন্য ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিলি, সে চাকরিটা হলো না কেন রে?

চমকে ওঠে শেখর, এবং আনমনার মত বিড় বিড় করে উত্তর দেয়—বলেছি তো, নিজেরই ভুলে। হঠাৎ একটা ভুল হয়ে গেল।

হ্যাঁ ভুল। শেখরের মনের ভিতরে বিচিত্র এক অনুভবের কপাটে কেউ যেন টোকা দিয়ে আস্তে আস্তে বলছে, ভুল করে ফেলেছো শেখর। শেখরের নিঃশ্বাস ছাপিয়ে যেন একটা অস্পষ্ট মধুরতা গুঞ্জন করে উঠছে, ভুল করে ভালই করেছো শেখর।

ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর ছড়ানো বইগুলির দিকে দৃষ্টি পড়ে, এগিয়ে গিয়ে একটা বই তুলে নিয়ে বারান্দার কোণে চেয়ারে বসে পড়তে চেষ্টা করে শেখর। কিন্তু বুঝতে পারে, বই নয়, শেখর যেন তার নিজের মনটাকেই পড়ছে। যে ঘটনাকে ভুলে যেতে ইচ্ছে করছে, সেই ঘটনার ছবিটাই বার বার মন জুড়ে ভেসে উঠছে।

অনেকক্ষণ, নীরব হয়ে গিয়েছে টালিগঞ্জের গলির ভিতর ক্ষুদ্র বাড়িটা। বিভাময়ী ফিরে এসেছেন। লক্ষ্মী-ঘট সাজিয়েছেন। রান্না চাপিয়েছেন। আর মধু ও বিধু ঘরের বাইরে গিয়ে খেলতে শুরু করেছে। ঘরের ভিতরে বিছানার উপর বসা অনাদিবাবুর মুখটাও প্রসন্ন। দেখতে পেয়ে শেখরের মুখটাও প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

হাঁপ ছাড়ে শেখর, মনের ভিতর থেকে একটা গ্লানির ভার নেমে যায়। শেখরের ভুলের জন্য এই বাড়ির ক্লিষ্ট অদৃষ্ট যে সুখের

প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তারই কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে শেখর।

ছাত্র পড়াবার কাজ নিতে কত ঘৃণাই না শেখরকে এতদিন বাধা দিয়ে এসেছে! অনাদিবাবুর বিস্ময়টা অহেতুক নয়। শেখর নিজেও আজ নিজের কাণ্ড দেখে একটু বিস্মিত হয় বৈকি! বেশ তো স্বচ্ছন্দে আজ নিজে এগিয়ে যেয়ে রতনবাবুর ছেলেকে পড়াবার কাজটা নিতে রাজি হয়ে এল। এবং সব অহংকারের মাথা খেয়ে রতনবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা আগাম চাইতে পারলো। উপোস করবো তবু ছেলে পড়ানো মাস্টারী কখনও করবো না, সেই অহংকের ঘৃণাটাকে আজ অনায়াসে জয় করেছে শেখর। বুকের আড়ালে নিঃশ্বাসের বাতাসে হঠাৎ এত সাহস এসে জুটে গেল কেমন করে? মনের ঐ ভুলের মধ্যেই কি এই প্রেরণার মায়া লুকিয়ে আছে? অবন্তী সরকার নামে সেই নারী, যার দুই কালো চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তি চিকচিক করে, সে নারী কল্পনাও করতে পারবে না যে, তারই সুখের জন্য নিজের সৌভাগ্যের পথ ছেড়ে দিয়ে শেখর নামে একটা মানুষ আজ একটা অতি সামান্যতা আর দীনতার সংসারে চুপ করে বসে আছে। নাই বা জানলো। শেখর যেন তার মনের একটা বেহায়া ভাবনাকে জোর করে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে। মস্ত বড় একটা ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে শেখর, এই তথ্যটা অবন্তী সরকার যদি না জানতে পারে, তাতে কি-ই বা আসে যায়? অবন্তী সরকারের মনের দশা কি হলো বা না হলো, সে তথ্য না জানলেও চলে অবন্তী সরকার না হয়ে অন্য কোন নারী, কিংবা কোন পুরুষও যদি শেখরের কাছে ওরকম করুণ আবেদন জানিয়ে উপকার প্রার্থনা করতো, তাহলে শেখর নিশ্চয় ঝোঁকের মাথায় এইরকমই একটা ত্যাগের কাণ্ড করে ফেলতো। কিন্তু···কিন্তু বার বার সেই ব্যক্তিকে মনে পড়তো কি?

ভাবতেও লজ্জা লাগে, অবন্তী সরকারের সেই ছায়া-ছায়া দুটো কালো চোখের শোভা দেখতে বেশ ভালই লেগেছিল! কে জানে,

উপকার করবার জন্য, কিংবা ঐ ক্ষণিকের অদ্ভুত ভাল-লাগার জন্য এই যে কাণ্ড করে চলে এল শেখর, সে কাহিনী লোকে শুনলে শেখরকে মুর্খ বলে উপহাস করবে, কিংবা একেবারে আদেখলা লোভী বলে মনে করবে?

যা হয়ে গিয়েছে, তা তো হয়েই গিয়েছে। কিন্তু মনের ভিতরে আবার এরকমের একটা ঝঞ্ঝাট ঘটে কেন? কেন আশা হয়, অবন্তী সরকার নিশ্চয় একদিন এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবে? কেন মনে হয়, অবন্তী সরকারও বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে ভাবছে, একটা মানুষ একটা অপরিচিত মানুষের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকারও করে! নিজের চিন্তার এই প্রশ্নগুলিই যে ভয়ানক দুর্বলতা। অবন্তী সরকারের মত একটি নারীকে জীবনের কাছে ডেকে এনে ভালবাসতে ইচ্ছা করছে, তাই কি?

সব প্রশ্নের বাড়াবাড়ি এখানেই থামিয়ে দিয়ে শেখর ভাবতে থাকে, যাদবপুরের সেই নতুন ল্যাবরেটরিতে একটা কাজ খালি আছে। আরও খোঁজ নিতে হবে, এবং কাজটা পাওয়ার জন্য চেষ্টাও করতে হবে।

দুপুর হতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে বের হয়ে যায় শেখর।

সাত

কাশীপুরের গলির সেই বাড়ি নয়, এটা হলো পার্ক সার্কাসের একটা নতুন বাড়ির ফ্ল্যাট। প্রতি রবিবারের সন্ধ্যায় এই ফ্ল্যাটের প্রথম ঘরের ছোট্ট টেবিলের উপর ফুলদানিতে টাটকা ফুলের গুচ্ছ হাসে আর সুগন্ধ ছড়ায়। এবং যতক্ষণ নিখিল না আসে ততক্ষণ চুপ করে বই পড়ে অবন্তী।

পর পর কয়েকটা মাস পার হয়ে গিয়েছে, অবন্তী সরকারের তিন'শো ষাট টাকা মাইনের চাকরির জীবনে আরও উন্নতির আশা দেখা দিয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার বলেছেন, অবন্তীর কাজ দেখে

আর একটু খুশি হবার সুযোগ পেলেই তিনি অবন্তীর মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেবার জন্য সুপারিশ করবেন।

কিন্তু নিখিলের জীবন এখনও শুধু ভাল চাকরির আশায় এবং চেষ্টায় দিন-রাত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। নিখিলের সেই চেষ্টাও যেন একটা রোগীর প্রাণের ছটফটানির মত। দিন-রাত শুধু চাকরির ভাবনাই ভাবছে নিখিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুটোছুটি করে। নিখিলের অমন সুন্দর ফরসা মুখের আভাও যেন মলিন হয়ে গিয়েছে।

অবন্তীও অনেকবার রাগ করে অভিযোগ করেছে—আমি থাকতে তোমার এত চিন্তা করবার কি আছে?

কিন্তু কি আশ্চর্য; অবন্তীর এই অভিযোগের মধ্যে যে বিপুল সান্ত্বনা আছে, সেই সান্ত্বনাকেই যেন ভয় করে নিখিল। শোনা মাত্র মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মুখটা আরও নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

অবন্তীও একদিন আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল—আমার কাছ থেকে টাকা নিতে সত্যিই কি তুমি দুঃখ পাও নিখিল?

হ্যাঁ। মনের ঝোঁকে একটা তীব্র আক্ষেপের মত স্বরে কথাটা বলেও ফেলেছিল নিখিল।

সজল হয়ে উঠেছিল অবন্তীর চোখ।—কিন্তু আমার যে তাইতেই আনন্দ। তোমাকে সাহায্য করতে পারছি, এই তো আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

নিখিল বলে—তুমি আমার দুঃখটা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছো না অবন্তী। আমি আজ পর্যন্ত তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারলাম না, এই আক্ষেপ যে আমার মনের ভিতর কাঁটার মত বিঁধছে।

ছিঃ। আরও নিবিড় অভিমানে দুই চোখ সজল করে নিখিলের কাছে এগিয়ে এসে আর একটা অভিযোগের কথা বলেছিল অবন্তী—আমার ভাগ্য কি তোমার ভাগ্য নয়? আমার টাকাকে তোমার নিজেরই টাকা বলে ভাবতে তোমার এই লজ্জার কোন মানে হয় না।

নিখিল হেসেছিল—তুমি ঠিকই বলেছ অবন্তী। আমি শুধু ভাবছি,

আর কতদিন ? কবে তুমিও আমার টাকাকে তোমার টাকা বলে মনে করবার সুযোগ পাবে, আর মনে করতে একটুও লজ্জা পাবে না।

শুনে দুঃখিত হয়ে উঠেছিল অবন্তীর মুখ। ঠিকই বলেছে নিখিল। অবন্তী নামে যে মেয়ের ফটোকে নিখিল তার বুক পকেটের ডায়েরির ভিতরে গোপন রত্নের মত লুকিয়ে রেখেছে, সে মেয়েকে আজও কোন উপকার করতে পারা গেল না, এই দুঃখ সহ্য করতে কষ্ট হয় নিখিলের। এই দুঃখ যে পুরুষের দুঃখ এবং এই দুঃখের লজ্জাও পুরুষের লজ্জা।

যতক্ষণ নিখিল না আসে ততক্ষণ ঘরের এই নীরবতার মধ্যে চুপ করে বসে অবন্তী তার মনের ভিতরের এই সব স্মৃতি, আর এই রকমেরই যত প্রশ্নের নীরব মুখরতা সহ্য করে। আসুক নিখিল, এসে যদি আবার মুখ বিষণ্ণ করে, এবং অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক সেই আগের মত বিস্ময় আর উজ্জ্বল হাসি ওর দুই চোখে উচ্ছল না হয়ে ওঠে, তবে আজ আবার রাগ করতে হবে। আজ আবার বলতে হবে, আমার মাথার উপর মাথা তুলে একটা মস্ত বড় গর্বিত পুরুষের মত কথা না বলতে পারলে তোমার মনে কোন আনন্দ হবে না, এ আবার কেমন মন ? না হয় আমার কাছে অহংকারে একটু খাটোই হলে নিখিল !

মাঝে মাঝে নীরব ঘরের ভিতরে এই প্রতীক্ষা আর ভাবনার মধ্যে অবন্তীর চেতনাটাই যেন আনমনা হয়ে যায়। এবং একদিন এমনই আনমনা হয়েছিল যে, ঘুমিয়ে পড়েছিল অবন্তী। নিখিল এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে ডাক দিতেই ধড়ফড় করে জেগে চেঁচিয়ে উঠেছিল —অ্যাঁ ! কি বলছেন আপনি ?

নিখিল হাসে—কার সঙ্গে কথা বলছো অবন্তী ? স্বপ্ন দেখছো নাকি ? অবন্তী বিব্রতভাবে বলে—না, ঠিক স্বপ্ন নয়। অন্য কথা ভাবছিলাম। অবন্তীর গম্ভীর চোখে-মুখে একটা ভীরু অস্বস্তির ছায়া ফুটে রয়েছে দেখে সেদিন একটু আশ্চর্যও হয়েছিল নিখিল। যে মেয়ে সর্বক্ষণ

হাসতে চায়, এবং নিখিলের গম্ভীর মুখ যে মেয়ে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারে না, সে মেয়েকে কিসের স্বপ্ন এত গম্ভীর করে দিল ?

নিখিল আবার হাসে—অনেকদিন পরে তোমাকে গম্ভীর হতে দেখলাম অবন্তী।

আর একবার চমকে ওঠে অবন্তীর চোখের ছায়া-ছায়া কালো। এবং রুমাল দিয়ে চোখ মুছে তারপর যেন দেখতে পায়, না, ভয় করবার কিছু নেই, সত্যিই কোন ভদ্রলোক লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে অবন্তীর মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে কোন প্রশ্ন করছে না।

নিখিল যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ বই পড়তে চেষ্টা করেও এক একদিন শুধু হয়রানিই সার হয়। অবন্তী যেন ইচ্ছে করেই আনমনা হয়ে যায়। এবং ভয়ও পায়। কি হবে উপায়, যদি নিখিলের জীবনটা এভাবে মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর শুধু চাকরি খোঁজার হয়রানিতেই হাসি হারাতে থাকে ? বাবার কাছেও এখন আর রহস্যটা অজানা নয়। এমন কি চারু হারু আর নরুও কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে, নিখিলবাবু একেবারে পর নন ; এবং একদিন যে একটা উৎসবের মধ্যে আরও সুন্দর হয়ে দেখা দিয়ে আরও আপন হয়ে যাবে নিখিল, এই বিশ্বাসের ছায়া এই বাড়ির সবারই চোখে মুখে লক্ষ্য করা যায়। অবন্তীর মনের গভীরে একটা ব্যাকুলতা মাঝে মাঝে যেন সব আগ্রহের জোর সঁপে দিয়ে প্রার্থনা করে, নিখিলের ভাগ্য একটু রঙীন হয়ে উঠুক, একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাক নিখিল। নইলে অবন্তীর ভালবাসার আশাগুলিই যে শুকিয়ে ঝরে পড়ে যাবে।

চোখ বন্ধ করে আজও বোধহয় নিজের মনের এই নীরব প্রার্থনার ভাষা শুনছিল অবন্তী। ঘরের ভিতর পায়ের শব্দ শুনেই চমকে ওঠে, চোখ খুলে তাকায়, হেসে ওঠে। আজ এতক্ষণ পরে, বেশ একটু দেরি করে নিখিল এসেছে।

নিখিল হাসতে চেষ্টা করে।—বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে আমার ওপর রাগ করে বসে আছ।

অবন্তী বলে—না, আর তোমার ওপর রাগ করতে পারছি না। রাগ হচ্ছে নিজেরই ভাগ্যের ওপর।

নিখিল—তার মানে?

অবন্তী—তার মানে তোমারই ভাগ্যের ওপর। কি আশ্চর্য; আজ পর্যন্ত তোমার একটা ভাল চাকরির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না।

নিখিল হাসে—একটা চিহ্ন দেখা গিয়েছে।

অবন্তীর চোখে হাসি ফুটে ওঠে।—তাই বল। এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম।

কি?

ভাবছিলাম, জীবনে কি এমন ভয়ানক অপরাধ করেছি যে, তোমার এই হয়রানি দিনের পর দিন শুধু দেখে দেখে চোখ ভেজাতে হবে।

ব্যথিতভাবে তাকায় নিখিল, কারণ দেখতে পেয়েছে নিখিল, অবন্তীর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

নিখিল বলে—আমিও তাই ভাবছি অবন্তী। ইচ্ছে করছে, তোমার কাছে চিরকালের ঋণ স্বীকার করে এইবার চলে যাই। সে ঋণ কোনদিন শোধ করবো না। কিন্তু তুমি আর……।

অবন্তীর চোখের ছায়া-ছায়া কালো যেন হঠাৎ বিদ্যুতের ছোঁয়ায় জ্বলে ওঠে।—কি বলতে চাইছো তুমি? ভালবাসা ভুলে যাব? তোমাকে ভুলে যাব?

নিখিল—ভুলে যেতে পারলে তোমার ভালই হতো অবন্তী।

অবন্তীর মুখ করুণ হয়ে ওঠে।—তুমি এত বেশি হতাশ হয়ে পড়লে কেন নিখিল? নিজেই তো বলছো যে……।

নিখিল—হ্যাঁ, একটা ভালো কাজের সন্ধান পেয়েছি। দরখাস্ত করেছি এবং সাড়াও পেয়েছি।

অবন্তী—কিসের কাজ?

নিখিল—যাদবপুরের একটা নতুন লেবরেটরিতে কেমিস্টের কাজ।

অবন্তীর মুখের ছায়াচ্ছন্ন মেদুরতা মুছে যায়। চোখে-মুখে যেন আশাময় একটা উৎফুল্লতার হাসি ফুটে ওঠে। ব্যস্তভাবে প্রশ্ন

করে। --আমাব মন বলছে, এ কাজটা তুমি পাবে।

নিখিল—ভরসা হয় না।

অবন্তী কেন?

নিখিল—খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমার চেয়ে অনেক বেশি কোয়ালি-ফাইড আর একজন প্রার্থী আছে। শেখর মিত্র নামে এক ভদ্রলোক রিসার্চে তার রেকর্ড খুবই ভাল।

চমকে ওঠে অবন্তী—কি নাম ভদ্রলোকের?

নিখিল—শেখর মিত্র। লেবরেটরির ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানিয়েছেন, যদি শেখর মিত্র এই কাজটা শেষ পর্যন্ত না নেয়, তবে আমাকে কাজটা দেবার কথা ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিংএ আলোচনা করা হবে। মনে হয়, তাহলে কাজটা আমিই পেয়ে যাব।

নীরব হয়ে তাকিয়ে শুধু শুনতে থাকে অবন্তী। এবং নিখিলও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে করুণভাবে হেসে ওঠে।—কিন্তু এরকম একটা অ্যাকসিডেন্ট যে হবেই হবে, সেটা কি করে বিশ্বাস করা যায় বল?

অবন্তী বলে—যদি হয়?

নিখিলের গলার স্বরও একটা আশাময় মধুরতার আবেগে টলমল করে ওঠে—যদি হয়···তবে··তারপর···তুমি মিছে কেন জিজ্ঞেস করছো অবন্তী। যদি হয়, তবে আমাদের স্বপ্নও যে সফল হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে অবন্তীর সারামুখ জুড়ে অদ্ভুত একটা বিশ্বাসের হাসি ছড়িয়ে পড়ে ঝিকমিক করতে থাকে। দু'চোখের ছায়া-ছায়া কালোর মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নতুন একটা প্রতিজ্ঞা যেন ছটফট করছে অবন্তীর বুকের ভিতরে। অবন্তী বলে—আমার একটা কথা বিশ্বাস কর নিখিল।

নিখিল—বল।

অবন্তী—এই কাজটা তুমিই পাবে।

আট

মাসের পর মাস, পুরোপুরি তিনটি মাস পার হয়ে গিয়েছে। শেখর মিত্রের জীবনের ঘরে কোন আলাদিনের প্রদীপের আলো চমকে ওঠেনি। ঐ সেই রতনবাবুর ছেলেকে পড়ানো, আর কাজের চেষ্টা। টালিগঞ্জের গলির ক্ষুদ্র বাড়ির ভাগ্যের উপর টাকা-পয়সার সুখ অবাধ হয়ে ঝরে পড়েনি। কিন্তু একটা পরিবর্তন দেখা যায়। বাড়ির মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এই বাড়ির ক্লিষ্ট প্রাণগুলির সেই বিমর্ষতা আর নেই।

কোন সন্দেহ নেই, এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে স্বয়ং শেখর। অনাদিবাবু দেখে আশ্চয হয়ে গিয়েছেন, তাঁর বড় ছেলের মুখের ভাবটাই বদলে গিয়েছে, চোখের দৃষ্টিটাও বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে। টালিগঞ্জের এই ক্ষুদ্র বাড়িটাকেই হঠাৎ যেন বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছে শেখর। মধু আর বিধুকে পড়াবার জন্য সারাদিনের মধ্যে অন্তত দুটি ঘণ্টা সময় হাতে রাখে শেখর। নিজের হাতে চা তৈরী করে অনাদিবাবুর হাতের কাছে তুলে দিয়ে গল্প করে শেখর। এমন কি, শখ করে নিজেই এক একদিন বিভাময়ীকে বারান্দায় একটা আসনের উপর বসিয়ে রেখে নিজেই রান্না করে। রান্নার একটা ডিক্সনারি কিনেছে শেখর। বেশ উৎসাহের সঙ্গে, মাঝে মাঝে মধু আর বিধুর সঙ্গে হুল্লোড় জমিয়ে সেই ডিক্সনারি দেখে মাছের নতুন রকমের রান্না রাঁধে শেখর। উঠানের একদিকে রজনীগন্ধার অনেকগুলি চারাও পুঁতেছে। টাকা-পয়সার হাসি নয়, কিন্তু বাড়িটা যেন প্রাণের হাসি হাসে।

আর একটা সত্য, তার খবর আর কেউ না জানুক, শেখর জানে, এবং জেনে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, তার মনের গভীরে একটি মায়ার ছবি হাসছে। পৃথিবীর একটা সুন্দর মুখের মেয়েকে হঠাৎ উপকার করতে গিয়ে বুকের ভিতরে এরকম অদ্ভুত এক অনুভবের ফুল ফুটে উঠবে, ভাবতেও পারেনি শেখর। কিন্তু কোথায় গেল

অবন্তী সরকার ?

আজ পর্যন্ত অবন্তী সরকারের আর কোন সংবাদ পায়নি শেখর। ইচ্ছে করলে তাকে তো এখনি গিয়ে দেখে আসতে পারা যায়। ঐ মিশন রো'তে সেই চারতলা বাড়ির ফ্ল্যাটে দি এগ্রিমেশিনারি লিমিটেডের অফিস। নিশ্চয় সেই অফিসেরই এক কক্ষে বসে এখন কাজ করছে অবন্তী সরকার।

সত্যিই কাজটা পেয়েছে তো অবন্তী? সন্দেহ হয় শেখরের। পেয়ে থাকলে অবন্তীর কাছ থেকে একটা ধন্যবাদের চিঠি শেখরের কাছে এতদিনে পৌঁছে যেত নিশ্চয়। কিংবা কোন অসুখে পড়েছে সেই মেয়ে, যার উপর একটা সংসারের প্রাণ বাঁচাবার দায় চেপে রয়েছে।

প্রভার বাড়িতে একদিন ঘুরে আসতেই শেখরের কল্পনার এই ভয়টা মিটে যায়। প্রভার ছেলের অন্নপ্রাশন ছিল। প্রভার ননদ অনসূয়ার সঙ্গে দেখাও হলো। খুশি হয়ে কত কথাই না বললো অনসূয়া। অনসূয়া বি-এ পাশ করেছে। অনসূয়া এরই মধ্যে একবার রাজগীর বেড়িয়ে এসেছে। অনেক ছবি এঁকেছে অনসূয়া। ভবানীপুরের এক মেয়ে স্কুলে টিচারের কাজ খালি হয়েছে। দরখাস্ত করেছে অনসূয়া। আশা করছে অনসূয়া, কাজটা হয়েই যাবে।

অনেক কথা বললো অনসূয়া এবং বিশেষ করে যার কথা অনসূয়ার মুখ থেকে শোনবার জন্য শেখরের সারা মন উৎকর্ণ হয়েছিল, তারই কথা বললো সব কথার শেষে।

আমার ভাগ্য বড় জোর ঐ টিচারি পর্যন্ত। অবন্তীর মত ভাগ্য সবারই হয় না।

শেখরের বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে অনসূয়া বলে—অবন্তীকে চিনতে পারছেন তো? সেই যে আমার বন্ধু, প্রভার বউ-ভাতের দিন নেমন্তন্নে এসেছিল। চমৎকার কথা বলতে পারে। বড় ভাল মেয়ে।

শেখর বলে—হ্যাঁ, মনে পড়ছে।

অনসূয়া—অবন্তী এসেছিল। ওর কাছ থেকেই সব খবর পেলাম। তিন শো ষাট টাকা মাইনের একটা কাজ পেয়েছে অবন্তী। কাজটার জন্য অনেক ভাল ভাল ক্যানডিডেট ছিল। কিন্তু অবন্তীই পেয়ে গেল। সাধারণ গ্র্যাজুয়েট হলে হবে কি? অবন্তী খুবই ট্যালেণ্টেড মেয়ে।

বাস, এই পর্যন্ত, অবন্তী সরকারের গল্প এখানেই শেষ করে দিল অনসূয়া। মাত্র এইটুকু খবর জানিয়ে গিয়েছে অবন্তী। তার মধ্যে শেখর মিত্র নামে একটা মানুষের নামের কোন উল্লেখ নেই। অবন্তী সরকারের ভাগ্যের কাহিনীর মধ্যে শেখর মিত্র নামে কোন নায়কের ঠাঁই নেই। অবন্তী বলতে ভুলে গিয়েছে। কে জানে কিসের জন্য?

যাক, তাহলে সুখী হয়েছে অবন্তী। এবং অবন্তী তার জীবনের অন্তত একটি ঘটনাকে দুর্লভ সম্পদের মত গোপন করে রেখেছে। শেখর মিত্র নামে একটি মানুষ গোপনে তাকে উপকারের যে উপহার দিয়েছে, সে উপহার অবন্তীর মনের ভিতবে লুকিয়ে রাখা গোপন ঐশ্বর্য। তাই কি? তাই তো মনে হয়। নইলে অনসূয়ার কাছে এত কথা বলেও শুধু ঐ ঘটনার গল্পটাকে নীরব ক'রে রেখে দিল কেন অবন্তী?

তবে কি ভুলেই গিয়েছে অবন্তী? বিশ্বাস হয় না। সেই উপহারের মূল্য বোঝে না অবন্তী, তাকে এত ক্ষুদ্র মনের মানুষ বলেই বা মনে করতে হবে কেন? কিন্তু তবে কি? শুধু এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না শেখর। অবন্তী কি শেখরের দু'চোখের দৃষ্টিকে সন্দেহ করলো আর ভয় পেল?

সন্দেহ করলে বড় ভুল করবে অবন্তী। সে তো নিজেই দেখতে পাচ্ছে যে, একটা মাস পার হয়ে গেল, তবু শেখর মিত্র নামে এক ভদ্রলোক কোন প্রতিদান পাওয়ার দাবি নিয়ে, এমন কি অবন্তীর কাছ থেকে একটা কৃতজ্ঞতার কথা বা প্রশংসার কথা শোনবার আগ্রহ নিয়ে, অবন্তী সরকারের সুন্দর মুখ দেখবার জন্য সামান্য একটা লোভ নিয়েও অবন্তীর চোখের সামনে উপস্থিত হতে চেষ্টা

করেনি। তবে ভয় করে কেন অবন্তী ?

বাড়ি ফিরে এসেই দেখতে পায় শেখর, একটা চিঠি এসে পড়ে রয়েছে। একটা কেজো চেহারার চিঠি, এবং চিঠিটা পড়তেই বুঝতে পারে, হ্যাঁ একটা কাজেরই চিঠি। যাদবপুরের সেই লেবরেটরিতে যে কাজটা পাওয়ার চেষ্টা এতদিন ধরে করে এসেছে শেখর, সেই কাজটার সম্পর্কেই উপরওয়ালার চিঠি এসেছে। ছ'টা মাস দু'শো টাকা মাইনেতে কাজ করতে হবে, তারপর পার্মানেণ্ট করা হবে। তখন মাইনে হবে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা। যদি রাজি হয় শেখর, তবে সাতদিনের মধ্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে কথা দিয়ে আসতে হবে।

কাজের চিঠি পড়া শেষ হতেই ডাকপিয়ন এসে একটা রেজিস্টারি করা চিঠি দিয়ে গেল। খুব বেশি আশ্চর্য না হলেও, শেখরের মনের ভিতরটা হঠাৎ একটু চমকে ওঠে, এবং খামের উপর লেখা প্রেরকের নামটা পড়তেই শেখর মিত্রের বুকের ভিতর নিঃশ্বাসের স্তরে স্তরে নিবিড় এক অনুভবের স্মৃতি রিমঝিম করে যেন বাজতে থাকে। অবন্তী সরকারের কাছ থেকেই এই চিঠি এসেছে।

'বাধ্য হয়ে আবার আপনাকেই স্মরণ করছি। আমার অনুরোধ, একবার আমাদেব বাড়িতে আসবেন। ঠিকানা দিলাম। হয় আজ, নয় কাল, সন্ধ্যাবেলা আপনারই অপেক্ষায় থাকবো। নমস্কার নেবেন। ইতি —অবন্তী সরকার।'

অবন্তীর চিঠিটা হাত থেকে নামিয়ে টেবিলের উপরে রেখে দিলেও বুঝতে পারে শেখর ; বুকের গভীরে অনুভবের সেই রিমঝিম থামতে চাইছে না। বাধ্য হয়ে শেখরকে স্মরণ করেছে অবন্তী। তার মানে, স্মরণ করতে বাধ্য হয়েছে ; তার মানে, ভুলে থাকতে অনেক চেষ্টা করেছে অবন্তী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুলে থাকতে পারেনি। এই তো, এ-ছাড়া এ-চিঠির আর কি অর্থ হতে পারে ? ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ! এই তিন মাস ধরে অবন্তীর নীরবতাকে একটা নির্মম বিস্মৃতি বলে যে সন্দেহ করেছিল শেখর, সে সন্দেহটাকে একেবারে

মিথ্যে করে দিল অবন্তীর এই চিঠি। ঐ বিস্মৃতি বিস্মৃতি নয়, স্মৃতির সঙ্গে একটা নীরব অভিমানের লড়াই। বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা! অবন্তীর চিঠির অর্থ খুঁজতে গেলে বারবার অনেকদিন আগের পড়া সেই কবিতার কথাগুলিই যে মনে পড়ে। অবন্তীর চিঠি শেখর মিত্রের জীবনে প্রথম মুগ্ধতার প্রতি যেন স্নিগ্ধ আশ্বাসের উপহার।

হয় আজ, নয় কাল। শেখরের মনে হয়, আজই ভাল। শ্রাবণের সন্ধ্যাগুলি রোজই ছু'এক পশলা বৃষ্টির জলে ভিজে যায়। আজ কিন্তু মেঘ নেই। এবং আজ সন্ধ্যাতেও মেঘ থাকবে না বলেই মনে হচ্ছে। তা'হলে আকাশ জুড়ে চাঁদের আলোও ফুটে উঠবে। কালের অপেক্ষায় না থাকাই ভাল। কে জানে কালকের দিনটা আজকের মত নির্মেঘ ও রোদে ঝলমল একটা দিন হবে কিনা, এবং কালকের সন্ধ্যাটা চাঁদের আলোয় ঝকমক করবে কিনা।

কিন্তু তারপর? শেখর মিত্রের ভাবনা যেন হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়ে বিহ্বল হয়ে যায়; এবং নিজের জীবনটাকেই ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে, তারপর কি হবে? অবন্তী সরকারের চোখের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য এভাবে আকুল হয়ে ওঠার শেষ পরিণাম কি দাঁড়াবে? অবন্তী যদি একেবারে অনায়াস আগ্রহে, একেবারে নিশ্চিন্ত মনে ও স্বচ্ছন্দে হাতটা এগিয়ে দেয়, তবে সেই হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে শক্ত ক'রে ধরে রাখতে পারবে তো শেখর? ভয় করবে না তো?

কিংবা, অবন্তী যদি প্রশ্ন করে; ভয়ানক শক্ত একটা প্রশ্ন;—আমাকে ভাল লাগলো কেন? মাত্র কিছুক্ষণের মত একটা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি এমন স্বর্গীয় শোভা দেখতে পেলেন যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন? তবে কি উত্তর দেবে শেখর মিত্র?

প্রশ্নগুলিকে নিয়ে যেন ফাঁপরে পড়ে শেখর। সত্যিই তো, কি উত্তর দিতে পারা যায়? এরকম হঠাৎ ভাললাগার অর্থ কি? এবং এই ভাললাগা কি সত্যিই ভাল মনের কোন মায়া? কিংবা নিতান্তই

একটা লোভ ?

বললে কি বিশ্বাস করবে অবন্তী, যদি বলা যায় যে, তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়েছে বলেই শেখর মিত্র তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছে ? এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই। কেন যে এই ইচ্ছে হলো, সে প্রশ্ন করো না। কারণ, সে প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু অবন্তী কি সত্যিই বুঝতে পেরেছে যে, অবন্তীরও ভাল লেগেছে ? শুধু একটা উপকার করেছে শেখর মিত্র, তারই জন্য কি এই ভাল-লাগা ? তাহ'লে ভুল করেছে অবন্তী। এরকম ভাল-লাগা কখনও ভালবাসা হয়ে ফুটে উঠতে পারে না। এ শুধু একটা উপকারকে ভালবাসা।

লজ্জা পায় শেখর। বৃথা মনের ভিতর এই সব প্রশ্নের কোলাহল তুলে লাভ কি ? আজই আর কয়েকঘণ্টা পরে, পার্ক সার্কাসের সন্ধ্যা যখন আলোয় ভরে যাবে, তখন অবন্তীকে চোখে দেখেই এই সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।

যদি স্পষ্ট ক'রে বলেই ফেলে অবন্তী, তবে শেখরও স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না। হ্যাঁ, ভাল লেগেছে তোমাকে। তুমি যেদিন ডাকবে, সেদিনই আবার আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়াবো। তুমি যতদিন অপেক্ষা করতে বলবে, ততদিন অপেক্ষায় থাকবো। যদি বল, না, আর একটা দিনও প্রতীক্ষা সহ্য করতে পারবো না, তবে বেশ তো, এই মাসেরই কোন দিনে তোমারই মনের মত একটি সন্ধ্যায় বিয়েটা হয়ে যাক্। উৎসবের ঘটা দরকার নেই ; গভীর রাতে আকাশের তারায় তারায় যেমন চোখে-চোখে কথা বলে মন জানাজানি করে ; তেমনই তুমি আর আমি দু'জনের মনের দাবি স্বীকার করে নিয়ে চিরকালের আপন হয়ে যাই। শালগ্রাম সাক্ষী হতে পারে ; রেজিস্ট্রারের সাক্ষাতেও হতে পারে। অবন্তীর নিজের একটা সংসার আছে। রুগ্ন বাপ, আর তিনটি ছোট ছোট ভাই। সেই সংসারের নীড় থেকে অবন্তীকে উপড়ে

নিয়ে আসতে পারা যাবে না, এবং উচিতও নয়। কিন্তু এটা কি আর এমন একটা ভয়ানক সমস্যা? থাকুক না অবন্তী; নিজের চাকরির রোজগারে তার বাপ আর ভাইদের জীবনের দিনগুলিকে সুখী করে রাখুক। অবন্তীর জীবনের এই রীতি-নীতির মধ্যে শেখর কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে না। একটুও আপত্তি করবে না শেখর।

শেখরেরও তো এইরকম একটা মায়ার দায়ে ভরা সংসার আছে। বাপ আর মা, এবং দুটি ছোট ছোট ভাই। অবন্তীও নিশ্চয় এমন কোন অদ্ভুত জেদ করবে না এবং করা উচিতও নয় যে, বিয়ের পর তোমাকে আমারই কাছে এসে থাকতে হবে। এটুকু নিশ্চয় জানে অবন্তী, কোন পুরুষের পক্ষে সে-রকম দাবি স্বীকার ক'রে বিয়ে করা সম্ভব নয়!

তাহলে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো? এলোমেলো ভাবনাগুলিকে একটু গুছিয়ে নিয়ে শেখর যেন তার ভালবাসার জীবনের রূপ কল্পনা করতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ, ভালই তো, দুজনের কেউ কারও দায় আর মায়ার নীড় হতে সরে যাবে না। সরে যাবার দরকার হয় না। অথচ, দু'জনের জীবন ভালবাসার রাখী ধারণ ক'রে আর-একটি অদেখা নীড় গড়ে তুলবে, যেখানে যে-কোন লগ্নে, আকাশে তারা থাকুক কিংবা চাঁদ থাকুক, শেখর মিত্রের বুকের উপরে লুটিয়ে পড়ে থাকতে পারবে অবন্তী। এবং শেখরও অবন্তীর মুখের হাসির দিকে তাকিয়ে বলতে পারবে, এই তো ভাল অবন্তী। সারাদিনের মধ্যে এই একবার দেখা, এবং তারপরেই অদেখা, এই তো ভাল। আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ভালবাসার জীবন ভাল নয়। ভালবাসা লোহার শিকল নয়, ভালবাসা হলো ফুলডোর।

মা হয় তো মাঝে মাঝে রাগ করবেন, এ কিরকম কাণ্ড শেখর? অবন্তী কি জানে না যে, ওর শ্বশুর শাশুড়ি আছে? বাপের সংসারেই কি চিরকাল পড়ে থাকবে বউ?

সমস্যা বটে। কিন্তু এই সমস্যার একটা সমাধানও মনে মনে খুঁজে পায় শেখর। মা'র মনে কোন ক্ষোভ থাকবে না, যদি অবন্তী এসে

মাঝে মাঝে শ্বশুর আর শাশুড়ির কাছে থাকে। অবন্তীরও কোন আপত্তি হবে না নিশ্চয়। আপত্তি কেন, খুশিই হবে অবন্তী।

রতন বাবুর ছেলেকে পড়াতে যাবার কথা যখন মনে পড়ে, তখন প্রায় দুপুর। পড়াতে যাবার সময় হতে এখনও কয়েক ঘণ্টা দেরি। কিন্তু আজ একটু আগে পড়াতে গেলেই তো ভাল হয়। বিকাল শেষ হবার আগেই ছাত্র পড়াবার কাজটা সেরে নিয়ে, তারপ তারপর ট্রামে চড়ে সোজা ময়দানে গিয়ে খোলা হাওয়ার ভি... একটা ঘণ্টা পার ক'রে দিলেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠবে। তারপর সেখান থেকে পার্ক সার্কাস পৌঁছে যেতেই বা কতক্ষণ?

নয়

পার্ক সার্কাসের বিপুল আকারের একটা নতুন বাড়ির একটা ফ্ল্যাট। প্রথম ঘরটি বেশ সুন্দর ক'রে সাজানো। সোফা আছে, রেডিও আছে, কার্পেট পাতা আছে, রঙীন লেসের পর্দা দরজায় ঝুলছে। প্রকাণ্ড ফুলদানিতে ফুলের স্তবকও আছে।

শেখর মিত্রকে দরজার কাছে দেখতে পেয়ে সন্ধ্যাবেলার আলোর মতই হেসে ওঠে অবন্তী সরকারের কালো চোখের তারা। কিন্তু শেখর মিত্র যেন ক্ষণিকের মত অপ্রস্তুত হয়ে তার নিজের চোখের বিব্রত বিস্ময়টাকে সামলে রাখবার চেষ্টা করে। বোধ হয় ঠিক এইরকমের একটা রঙীন অভ্যর্থনা আশা করেনি শেখর।

হ্যাঁ, রঙীনই বটে। অবন্তী সরকারের মূর্তিটাও রঙীন হয়ে গিয়েছে। সেই মার্বেলের মত সাদাটে রঙে সাজানো চেহারা নয়। অবন্তীর সিল্কের শাড়িতে রঙীনতা, তার গলার সোনার হারের লকেটটাও একটা রঙীন পাথর।

শেখরকে বসতে অনুরোধ ক'রে অবন্তী ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

শেখর আশা করে, অবন্তী সরকারের বাবা কিংবা বাড়ির আর

কেউ এখনি সামনে এসে শেখরকে দেখে খুশি হবে আর গল্প করবে। শেখর মিত্রের নামটাকে এই বাড়ির কানের কাছেও কি কোনদিন উচ্চারণ করেনি অবন্তী? হতে পারে না।

কিন্তু অবন্তী একাই ফিরে এল। হাতে খাবারের প্লেট এবং চায়ের কাপ। অবন্তী সরকারের কালো চোখে সেই বুদ্ধির দীপ্তি বড় সুন্দর হয়ে আবার চিকচিক করতে থাকে।

শেখরবাবু! কথা বলেই লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরায় অবন্তী।

শেখর বলে—আপনি ভাল আছেন তো?

অবন্তী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—না। সেই জন্যই আপনাকে ডেকেছি শেখরবাবু।

শেখর—বলুন।

অবন্তী ভ্রূভঙ্গী ক'রে হাসে।—আমি আপনার বোনের ননদ অনসূয়ার বন্ধু। আমাকে 'আপনি' করে বলবেন না।

তার পরেই সোজা শেখর মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে অবন্তী বলে—তা ছাড়া, আপনিই একমাত্র মানুষ, যাঁর কাছ থেকে আমি উপকার পেয়েছি। লোকে আমাকে অহংকারী বলে জানে, কথাটা খুব মিথ্যে নয়। কিন্তু আপনিই তো জানেন আমি আপনার কাছে মাথা হেঁট করেছি। জীবনে আর কারও কাছে মাথা হেঁট করিনি।

বিব্রতভাবে শেখর বলে—একথার কোন অর্থ হয় না। দরকারে পড়ে একটা দাবি করেছিলে তুমি, তাকে মাথা হেঁট করা বলে না।

অবন্তী—জানি না, কেন আপনার কাছ থেকে উপকার চাইবার এত সাহস হঠাৎ মনের ভিতর এসে গেল।

শেখর হাসে—তুমিই জান, কেন তোমার সে সাহস হলো?

অবন্তী—আমি জানি। আপনাকে দেখে কেন জানি মনে হয়েছিল যে, আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন।

শেখর—সেটা তোমার মনের গুণ, আমার কোন গুণ নয়।

অবন্তী—যাই হোক, আমার লাভ এই যে, আপনার কাছে আমার জীবনের কোন দুঃখের কথা বলতে আমার মনে কোন লজ্জার বাধা

নেই। আপনিই আমার ভয় ভেঙ্গে দিয়েছেন।

শেখরের মনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সেই অদ্ভুত মায়াচ্ছবির হাসিটা যেন আরও নিবিড় হয়ে শেখরের চোখের উপর ফুটে ওঠে। অলীক স্বপ্ন নয়; কল্পনাও নয়; সত্যিই অবন্তী সরকার আজ শেখরের চোখের কত কাছে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে গল্প করছে!

শেখর বলে—তোমার কথা শুনে আমারই মনের ভয় ভেঙ্গে গেল অবন্তী।

অবন্তী—কিসের ভয়?

শেখর—আমার ভয় হয়েছিল, আমার কাছে ওরকম একটা উপকার পাওয়ার অনুরোধ ক'রে তুমি লজ্জা পেয়েছ, এবং সেই লজ্জাতে, আর হয়তো আমার মনটাকেও সন্দেহ করে আমার কাছ থেকে একেবারে আড়াল হয়ে লুকিয়ে থাকছো।

অবন্তী—আপনাকে ভুলে যাব, এমন অসম্ভবও আপনি বিশ্বাস করেন শেখরবাবু?

শেখর বলে—না অবন্তী।

অবন্তী—তাই তো বিপদে পড়ে আপনারই কথা মনে হলো, তাই আপনাকে ডেকেছি।

শেখর—বিপদ?

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—কিসের বিপদ?

অবন্তী—যাদবপুরের একটা নতুন লেবরেটরিতে নতুন একটা কাজে লোক নেওয়া হবে।

শেখর আশ্চর্য হয়—হ্যাঁ।

অবন্তী—আমারই বান্ধবীর দাদা হন, তাঁর নাম নিখিল মজুমদার, তিনি ঐ কাজের জন্য দরখাস্ত করেছেন।

শেখর—তা জানি না।

অবন্তী—কাজটা এতদিনে তিনিই পেয়ে যেতেন। কিন্তু বাধা দিয়েছে আপনার দরখাস্ত।

শেখর—তার মানে ?

অবন্তী—বুঝতেই তো পারছেন, আপনার মত কোয়ালিফাইড লোক পেলে নিখিল মজুমদারের মত সাধারণ একজন বি-এস-সি'কে ওরা নেবে কেন ? ওরা বলেছে, শেখর মিত্র নামে ক্যানডিডেট যদি ঐ কাজ নিতে শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়, তবেই নিখিল মজুমদার কাজটা পাবে।

শেখরের চোখে যেন অদ্ভুত এক কৌতূহলের আগুন জ্বলে উঠতে চাইছে। এ কেমন বিপদ ? নিখিল মজুমদার ঐ ভাল মাইনের কাজটা না পেলে অবন্তী সরকারের জীবন দুঃখিত হবে কেন ? অবন্তী সরকারের জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিখিল মজুমদার কে ? গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে শেখর—নিখিল মজুমদারের কাজ না হলে সেটা তোমার বিপদ কেন হবে, বুঝতে পারছি না।

উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করে অবন্তী সরকার। কিন্তু ঐ নিরুত্তর ভঙ্গীই যে ভয়ংকর স্পষ্ট একটা উত্তর। খুব স্পষ্ট ক'রে, কোন কুণ্ঠা না রেখে জানিয়ে দিচ্ছে অবন্তী সরকার, নিখিল মজুমদার নামে একটি মানুষ সুখী হলে অবন্তী সরকারের জীবনের আশা পূর্ণ হয়।

শেখর—নিখিল মজুমদার কি তোমার অনেক দিনের চেনা ?

অবন্তীর মুখ লজ্জায় লালচে হয়ে ওঠে। চোখের চাহনি নিবিড়। লিপস্টিক দরকার হয় না যে ঠোঁটে, সেই ঠোঁটের রক্তাভাও যেন লাজুক হাসি হাসে।

অবন্তী বলে—না। একবছরের চেয়ে কিছু বেশি হবে।

শেখর—তার মানে, তোমার চাকরিটা হবার বছর খানেক আগে।

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—তুমি কি নিখিল মজুমদারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, অর্থাৎ তার সম্মতি নিয়ে আমাকে এই অনুরোধ করছো ?

ব্যস্তভাবে আপত্তির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে অবন্তী—না, আপনার নাম তার কাছে কখনও করিনি। সে বড় আত্মসম্মানী মানুষ, শুনলে কখনই রাজি হতো না।

শেখর—নিখিল মজুমদার যদি ঐ কাজটা না পায়, তবে ?

অবন্তী—না পেলে চলবে কি করে শেখরবাবু ?

শেখর—তার মানে ?

অবন্তী—নিখিল যে তাহলে…।

শেখর—নিখিল মজুমদার তাহলে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না ?

অবন্তী উদাস ভাবে বলে—সে হয় তো রাজি হবে, কিন্তু… ।

শেখর হাসে—কিন্তু তুমি কি ক'রে রাজি হবে ? তাই না ?

অবন্তী—আপনি তো বুঝতেই পারছেন।

শেখর হাসে—আমার বোঝবার আর কোন দরকার নেই অবন্তী সরকার।

আর কোন কথা না বলে, এবং অবন্তী সরকারকে চমকে দিয়ে ঘর ছেড়ে সোজা দরজার দিকে এগিয়ে যায় শেখর ।

শেখরবাবু। প্রায় চেঁচিয়ে ডাক দেয় অবন্তী সরকার। ডাকটা আর্তনাদের মত শোনায়। অবন্তী সরকারের কালো চোখ করুণ হয়ে মেঘলা সন্ধ্যার মত তাকিয়ে থাকে।

অবন্তী বলে—আমি জানি, আপনার উপর বড় বেশি দাবি করছি, অথচ দাবি করবার কোন অধিকার নেই।

বেশ শক্ত স্বরে অথচ শান্তভাবে উত্তর দেয় শেখর—অধিকার ছিল।

অবন্তী—কি বললেন ?

শেখর—সত্যিই কি শুনতে পাওনি ?

অবন্তী—না।

শেখর—তা হলে আর প্রশ্ন করো না। আমি চলি।

অবন্তী—আপনি কি সত্যিই আমার অনুরোধ শুনে রাগ করলেন ?

শেখর—শুনে সুখী হলাম যে তুমি একটা মানুষকে ভালবাসতে পেরেছ।

অবন্তী—সে ভালবাসা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আপনি… ।

অবন্তীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে শেখর।

তারপরেই বলে—কি বলতে চাও তুমি ?
অবন্তী—আপনি নিখিলকে ঐ কাজটা নেবার সুযোগ দিন।
শেখর—তার মানে আমি কাজটা নিতে রাজি না হই, এই তো ?
অবন্তী—হ্যাঁ।
শেখর—বেশ, তাই হবে।
চলে যায় শেখর। অবন্তী সরকারের সিল্কের শাড়ির আঁচল দুলে ওঠে। তরতর ক'রে হেঁটে শেখরের পাশে পাশে চলতে চলতে পথের কিনারা পর্যন্ত এগিয়ে আসে অবন্তী।
দূরের ট্রামের মাথায় নীল লাল আলোকের চোখ জ্বলজ্বল করছে। এগিয়ে আসছে ট্রাম। লাইনের তার ঝনঝন ক'রে বাজে। অবন্তী সরকারের হাসিমাখা উজ্জ্বল মুখের দিকে শেষ বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলে মুখ ফিরিয়ে নেয় শেখর।
অবন্তী বলে—জানি না, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো শেখরবাবু। আপনি যে উপকার করলেন, তেমন উপকার কোন আপনজনও করে না।

দশ

আবার বোধহয় ভুল হলো। হোক ভুল। এই ভুলের স্মৃতি শুধু শেখরের জীবনে গোপন হয়ে আর নীরব হয়ে থাকবে। কেউ জানবে না যে, শেখর মিত্র তার জীবনের প্রথম মায়ার ছবিকে চোখের কাছে রেখে দেখতে গিয়ে চোখভরা জ্বালা আর একটা কৌতুকের দংশন নিয়ে ফিরে এসেছে।
শুধু তাই নয়, সেই নিষ্ঠুর কৌতুককেই আবার একটা উপহার দিয়ে এসেছে। নিজেরই সৌভাগ্যের হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নিয়ে অবন্তী সরকারের কাছে নিবেদন ক'রে চলে এসেছে।
অবন্তী সরকার কেন নিখিল মজুমদারকে ভালবেসেছে, এই প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না। এর জন্য অভিমান করারও কোন অর্থ হয়

না। অবন্তী সরকার তার নিজের স্বপ্নের জগতে আছে। নিজের ভালবাসার মানুষের সুখের জন্য যতটুকু করা সাধ্য, তাই করেছে। অবন্তী সরকার কোনদিন বলেনি যে, শেখর মিত্র নামে উপকারী একটা মানুষের জন্য তার মনের পাতায় কোন মুহূর্তেও এক ফোঁটা মায়ার শিশির স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। শেখর মিত্রের ভুল ঘটিয়েছে শেখর মিত্রেরই মন। অবন্তী সরকার নামে একটি মেয়ের কথা দিনের পর দিন মনের ভাবনায় পুষে রাখবার জন্য কেউ তাকে দিব্যি দেয়নি। অবন্তীকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতে পারলো না কেন, এবং আজও পারছে না কেন শেখর? বুঝতে পারে শেখর, আসল ভুল হলো নিজেকেই চিনতে না পারা। যার সঙ্গে কোন স্বার্থের সম্পর্ক নেই, তারই জন্য বার বার এভাবে নিজের স্বার্থ তুচ্ছ করা বোধহয় মনেরই একটা রোগ। অতি কোমল দুর্বল ও মেরুদণ্ডহীন একটা পৌরুষ, যার প্রতিজ্ঞার জোর অবন্তী সরকারের মতো মেয়ের কালো চোখের কৌতুকের কাছে বার বার জব্দ হয়ে যায়।

ভালোবাসা কাকে বলে, এই প্রশ্ন নিয়ে জীবনে কোনদিন মাথা ঘামায়নি শেখর। কেন মানুষ ভালবাসে, কিসের জন্য ভালবাসে কে জানে? অবন্তীই জানে, কেন নিখিলকে তার এত ভাল লাগলো, আর শেখর মিত্রের চোখের দৃষ্টিটার মধ্যে সে কোন অর্থই খুঁজে পেল না। কিন্তু অবন্তী সরকারের জন্য শেখর মিত্রের মনের এই যে দশা, সেটা কি একটা মোহ মাত্র? ভালবাসা নয়?

অন্য কারো উপরে নয়, রাগ হয় শুধু নিজের উপর। চোখভরা এই যে জ্বালা, সেটা শুধু একটা আত্মধিক্কার। অবন্তীর কথা মনে পড়লে রাগ হয় না। নিখিল মজুমদার নামে এক ব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্রও আক্রোশ জাগে না। বরং, ভাবতে ভাল লাগে যে, অবন্তী সরকারের ভয়ানক অনুরোধের কাছে আজও জয়ী হয়ে ফিরে এসেছে শেখর। শেখর আপত্তি করলে অবন্তী সরকারের পক্ষে শেখরকে একটিও কঠোর কথা বলবার অধিকার ছিল না। তবু অনায়াসে অবন্তীকে অবন্তীর স্বপ্নের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য

করবে বলে কথা দিয়ে এসেছে শেখর।

বাড়ি ফিরে এসে প্রথম যে কাজটা করে শেখর, সেটা হলো একটা চিঠি লেখার কাজ। যাদবপুরের নতুন লেবরেটরির ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে যথাসৌজন্যের সঙ্গে জানিয়ে দেয়, ঐ কাজ নিতে রাজি নয় শেখর মিত্র।

চিঠিটা ডাক বাক্সে ফেলে দিতেই মনটা হাল্কা হয়ে ওঠে। জীবনের একটা সুন্দর উদ্‌ভ্রান্তির নাটক এইখানে সমাপ্ত হয়ে গেল। অবন্তী সরকার নামে একটা গল্প শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়বে। এর চেয়ে বেশি কোন বিড়ম্বনার ভয় জীবনে আর রইল না। যাকে ভাল লেগেছিল তারই জন্য শেষ পর্যন্ত ভাল ভাবে একটা ভাল কাজ ক'রে দিতে পারা গেল। কোন ক্ষতি হয়নি, ঠকেওনি শেখর। নিজেরই ত্রিশ বছর বয়সের বুকের ভিতরে ফুটে ওঠা একটা ভালবাসাকে সম্মানিত করেছে শেখর। ভুল নয়, বোকামিও নয়।

উঠানের কোণে রজনীগন্ধার চারা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। মধু আর বিধু অনেকগুলি দোপাটি আর গাঁদাও লাগিয়েছে। মা উঠানের উপর মাদুর পেতে বসে একমনে রামায়ণ পড়েন। অফিস থেকে ফিরে আসেন অনাদিবাবু। শেখর বলে—তোমার ও মা'র দুটো অয়েল পেন্টিং করাবো বাবা।

অনাদিবাবু হাসেন—আপাতত আমাকে এক কাপ চা ক'রে দে দেখি।

.গার

চা-এর কাপ হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবেন অনাদি বাবু। চা-এর কাপে একটা চুমুক দেবার পর আবার কিছুক্ষণ আনমনার মত তাকিয়ে থাকেন। এই কিছুক্ষণ আগে অনাদিবাবুর যে ক্লান্ত মুখটাকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছিল, সেই মুখের উপরে একটা বিষণ্ণতার ধোঁয়াটে ছায়া যেন ঘন হয়ে উঠেছে। সত্যিই অস্ফুট·

স্বরে আক্ষেপের মত কি-একটা কথাও যেন বলে ওঠেন অনাদিবাবু।
শেখর বলে—কি হলো বাবা? চা-এর চিনি ঠিক আছে তো?
অনাদিবাবু—না।
শেখর—চিনি কম হয়েছে?
অনাদিবাবু—হ্যাঁ।
চামচ ভরে চিনি নিয়ে এসে অনাদিবাবুর চা-এ ঢেলে দেয় শেখর। এইবার চা বেশ মিষ্টি, খুব বেশি মিষ্টি হয়ে ওঠে ঠিকই। কিন্তু দেখে বোঝা যায় না, অনাদিবাবুর মুখের সেই অপ্রসন্ন ভাব কেটে গিয়েছে কি না, এবং আগের মত প্রসন্নতায় মিষ্টি হয়ে উঠেছে কি না। বরং দুশ্চিন্তিতের মত ভুরু কুঁচকে একটা কথা বললেন অনাদিবাবু—বাড়িটা এবার নীলামে চড়বে শেখর।
শেখর—কেন?
অনাদিবাবু—কেন আবার কি? বাড়িটা যে ব্যাঙ্কের কাছে মর্টগেজ আছে, সেটা কি ভুলেই গিয়েছিস?
শেখর—হ্যাঁ…না…ভুলিনি ঠিকই, কিন্তু সব সময় মনে থাকে না।
মনে না থাকলে চলবে কি ক'রে? সুদ প্রায় মূল ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর কতদিন অপেক্ষা করবে ব্যাঙ্ক?
আমাকে কি করতে বলছো?
দেনা শোধ কর।
দেনাটা এখন দাঁড়িয়েছে কত?
সুদ আর মূল নিয়ে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার।
এখনি সাড়ে ছয় হাজার টাকা পাব কোথা থেকে বল?
না পেলে বাড়িও থাকবে না। নীলাম হয়ে যাবে।
কোন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে ভাবতে থাকে শেখর। এবং অনাদিবাবুর সেই গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখ এইবার বেশ একটু তিক্ত হয়ে ওঠে অনাদিবাবু বলেন—তার মানে, গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে তোমার মত শিক্ষিত ও ইয়ং একটি ছেলে থাকতে বাপ-মা আর ছোট-ছোট দুটো ভাই গাছতলায় গিয়ে ঠাঁই নেবে, ভাবতে তোমার

একটু লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি ?

লজ্জা ? শুধু লজ্জা কেন ? বুঝতে পারে শেখর, তার মনের ভিতরে যেন একটা জ্বালা ধরেছে। কোন শব্দ না ক'রে জীবনের একটা অসার উল্লাস যেন পুড়তে শুরু করেছে। সুখী হয়নি এই বাড়িটা, সুখী হতে পারে না। ছাত্র-পড়ানো রোজগারের এক'শো টাকা দিয়ে ডাহা উপোসের অভিশাপ থেকে যদিও বা বাঁচা যায়, কিন্তু সুখী হওয়া যায় না। শুধু টিকে থাকাই বেঁচে থাকা নয়। এবং গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকা মরে যাওয়ার চেয়ে ভাল নয় নিশ্চয়। বাবার আক্ষেপটা অকারণ বিরক্তির চিৎকার নয়। এই আক্ষেপ যে সত্যিই একটা আর্তনাদ।

শেখর বলে—বাড়িটাকে নীলাম থেকে বাঁচাবার কি উপায় হতে পারে বুঝতে পারছি না।

অনাদিবাবু—যদি সুদটা আর বাড়তে না দেওয়া হয়, তবে ব্যাঙ্ক কিছু বলবে না। আপাতত নীলাম থেকে বাড়িটা বেঁচে যাবে। এখন প্রতিমাসে সুদ দাঁড়িয়েছে প্রায় চল্লিশ টাকা। যদি অন্তত এই চল্লিশ টাকা মাসে মাসে দিয়ে ফেলা যায়, তবে ব্যাঙ্ক আপাতত তুষ্ট থাকবে।

শেখর—তাহ'লে তাই কর।

চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু—আমি কি করবো ? আমাকে একথা বলতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।

শেখর বলে—তার মানে আমিই দেব।

অনাদিবাবু—কোত্থেকে দেবে ? তোমার ঐ ছেলে-পড়ানো রোজগার একশো টাকা থেকে ?

শেখর—হ্যাঁ।

অনাদিবাবু—তার মানে সংসারের ভাত-কাপড়ের খরচের জন্য এখন থেকে মাত্র ষাটটা টাকার বেশি তুমি দিতে পারবে না।

শেখর হাসে—শেষ পর্যন্ত তাই তো দাঁড়ালো।

অনাদিবাবু—বাপ-মা-ভাইদের ওপর সত্যি সত্যি মনের দরদ থাকলে

তুমি একথা বলতে পারতে না শেখর। বলাইবাবুর ছেলে পরেশটা আজ প্রায় চার বছর হলো সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে হরিদ্বারে থাকে। সেই পরেশও বলাইবাবুকে প্রতি মাসে দু'শো টাকা পাঠায়। কিন্তু তুমি···।

অনাদিবাবুর কথাগুলি কাঁটাগাছের ডালের আঘাতের মত শেখরের বুকের ভিতরটাকে যেন আঁচড়ে চিরে ক্ষতাক্ত ক'রে দিচ্ছে। সাধ ক'রে, একটা অতি-চতুর সুন্দর মেয়ের ছলছল চোখের ছলনার কাছে নিজেরই সুস্থ-বুদ্ধিটাকে বলি দিয়ে এসেছে শেখর। যাদবপুরের লেবরেটরির চাকরিটাকে অবন্তী সরকারের অনুরোধের মোহে এভাবে ছেড়ে না দিলে আজ অনায়াসে ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করবার প্রতিজ্ঞা অনাদিবাবুর কাছে এই মূহুর্তে ঘোষণা ক'রে দিতে পারতো শেখর, এবং অনাদিবাবুর মুখে অগাধ প্রসন্নতার হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারতো।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু—তোমার নিজেরই জীবনের ওপর তোমার কোন দরদ নেই শেখর।

চমকে ওঠে শেখর; এবং চোখ দুটোও থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। অনাদিবাবুর অভিযোগ এক বিন্দুও অতিশয়োক্তি নয়। নিজেরই ওপর কোন দরদ নেই শেখরের। শেখর মিত্রের জন্য যে নারীর মনে এক ফোঁটাও মায়া নেই, সেই নারীকেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে, এই ভুলের অভিশাপ চরম হয়ে উঠেছে। গল্পে শোনা যায়; সুন্দরী নর্তকীর একটি কটাক্ষের ইঙ্গিতে কত রাজা-মহারাজা তার সর্বস্ব সেই নারীর পায়ের কাছে ঢেলে দিয়ে ফতুর হয়ে গিয়েছে। সেই রকমেরই একটা মূঢ়তা কি শেখর মিত্রের মত বিজ্ঞান-জানা মানুষের যুক্তি–বুদ্ধির শক্তি লোপ করে দিল? শুধু ঠকবার জন্য, শুধু নিজেকে রিক্ত ক'রে দিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যাবার জন্য একটা নেশায় পেয়ে বসলো জীবনটাকে?

জোর ক'রে, যেন নিজেরই উপর মায়া ছড়িয়ে দিয়ে শান্ত হতে চেষ্টা ক'রে শেখরের মন। না, আর নয়। তা ছাড়া আর ভাববার আছেই

বা কি ? অবন্তী সরকারের ভালবাসার ইতিহাস নিজের কানেই শোনা হয়ে গিয়েছে। সে ভালবাসার পরিণাম প্রায় তৈরী হয়েই গিয়েছে। নিখিল মজুমদার নামে একটি মানুষকে আপন ক'রে নিয়ে ধন্য হয়ে যাবে অবন্তী সরকারের জীবন। রঙ্গমঞ্চের শেষ অঙ্কের শেষ হয়ে এসেছে, ড্রপ সীন পড়তে আর দেরি নেই। শেখরের জীবনেও মনের ভুলে এক নারীকে ভালবাসবার ইচ্ছাটা নিজেরই বিদ্রূপে মরে গিয়ে এইবার কবরের মাটিতে মিশে যাবে। মিশে গিয়েছে বোধ হয়। বুঝতে পারে শেখর; এতক্ষণের মনের ভিতরে সেই কামড় শান্ত হয়ে গিয়েছে। এবং মনেও পড়ে, রেডিয়েশন সম্বন্ধ একটা প্রবন্ধ অর্ধেক লেখা হয়ে পড়ে আছে। সেই লেখাটা সম্পূর্ণ করলে কেমন হয় ? লেখাটা এদেশের কোন কাগজে না নিক, বিদেশের কোন কাগজে নেবে বলেই তো মনে হয়। এবং তাহ'লে অন্তত শ' পাঁচেক টাকা কি পাওয়া যাবে না ?

বার

টাইপিস্ট চারুবাবুর কথাগুলি শুনতে বেশ ভালো লাগে অবন্তীর। সাদাসিধা সরল মেজাজের বুড়ো মানুষ। আজকালকার মেয়েদের উপর একটুও রাগ নেই তাঁর মনে। আজকালকার মেয়েরা চাকরি করে, দেশের এই নতুন রীতির হাওয়া খুব পছন্দ করেন চারুবাবু। যখন তখন অবন্তীর কাছে অবন্তীরই প্রশংসা করেন—এই তো চাই মা, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, মেয়ে হলেই যে ঘরকুনো হয়ে পরের গলগ্রহ হয়ে পড়ে থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

সেদিন কথায় কথায় নিজের এক ভাগ্নের নামে একটা গল্প বললেন টাইপিস্ট চারুবাবু, আর সেই গল্প শুনে চমকে ওঠে অবন্তী, তারপরেই মনে মনে হেসে ফেলে। মামা জানেন না যে, তাঁর ঐ ভাগ্নেই অবন্তী সরকারের ভালবাসার পাত্র হয়ে প্রতি সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাসের এক নতুন বাড়ির এক ফ্ল্যাটের একটি সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরের নিভৃতে

বসে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চারুবাবু বললেন—আমার এক ভাগ্নে আছে, তার নাম নিখিল মজুমদার, বড় ভাল ছেলে। সেও দেখছি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছে যে, রোজগেরে মেয়ে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

অবন্তী হেসে হেসে প্রশ্ন করে—আপনার ভাগ্নের মনে এরকম আইডিয়া দেখা দিল কেন? ভদ্রলোক বোধহয় নিজে কোন কাজ না ক'রে ঘরে বসে থাকতে চান?

চারুবাবু—না, মোটেই তা নয়। ভাগ্নে বাবাজীর বক্তব্য এই যে, রোজগেরে স্ত্রীর ভালবাসাই হলো সত্যিকারের ভালবাসা। স্বামী খাওয়ায় পরায় বলে বাধ্য হয়ে যে ভালবাসা বেশির ভাগ স্ত্রী বাসে, সেরকম ভেজাল ভালবাসা নয়।

বাঃ! ঠাট্টার ভঙ্গীতে অবন্তী কথাটা বললেও, ঐ ছোট্ট কথাটা যেন একটা অভিনন্দনের সুরে বেজে ওঠে। নিখিল মজুমদারের মন চিনতে পারা গেল। কী সুন্দর মন!

সেদিনই সন্ধ্যাতে কী সুন্দর একটা উৎসবের মতো সাড়া জেগে উঠলো পার্ক সার্কাসের নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটে সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরে। চারু হারু আর নরু নিখিলের সঙ্গে ক্যারম খেলায় মেতে ওঠে। নরু হঠাৎ একটা আনন্দের কথা চেঁচিয়ে বলেই ফেলে—আমরা জানি নিখিলদা, শিগগির। আপনি আমাদের কে হবেন?

চারু ও হারু হেসে হেসে ধমক দেয়—চুপ কর বোকা!

নিখিল মুগ্ধভাবে হাসে, আর অবন্তী সরকার মুখ লুকিয়ে হাসে।

নিবারণবাবুও এই ঘরের ভিতরে এসে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। নিখিলের সঙ্গে গল্পও করলেন অনেকক্ষণ। তিনি জানেন, সবই জানেন, অবন্তী সরকার নিজের মুখে তাঁর কাছে সব কথা বলে দিয়েছে। এবং শুনে খুশি হয়েছেন নিবারণবাবু। ভগবানের অশেষ দয়া। নইলে নিখিলও এত ভাল একটা কাজ এত সহজে পেয়ে যাবে কেন? আর, সেই নিখিল তাঁদের আপনজন হয়ে যাবার জন্য এত আগ্রহই বা দেখাবে কেন?

যখন ঘরে আর কেউ থাকে না. শুধু সোফার উপর পাশাপাশি বসে নিখিল আর অবন্তী গল্প করে, তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, রাত মন্দ হয়নি।

নিখিল বলে—কি ভাবছো অবন্তী ?

অবন্তী বলে—আমার ভাগ্যের কথাটাই ভাবছি। অদ্ভুত !

নিখিল—তাহ'লে আমার ভাগ্যের কথাও ধর।

নিখিলের মূর্তিটাকে আজ দেখতে বেশ নতুন রকমের মনে হয়। মুখের হাসিটাও নতুন। চোখের দৃষ্টিও যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে। এবং কথা বলবার ভঙ্গীটাও অভিনব। বেশ মাথা উঁচু ক'রে আর অবন্তীর মুখের দিকে সোজা, বড় স্পষ্ট ও বড় স্বচ্ছন্দ একটি আগ্রহের উজ্জ্বলতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে নিখিল। অবন্তী সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতার ভারে বিনত নিখিলের সেই মূর্তি আর নেই। নিখিলের ভালবাসার অধিকার যেন নতুন-পাওয়া একটা গর্বের জোরে এতদিনে টান হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। নিখিলের যে মন এতদিন যে আক্ষেপ সহ্য করতে গিয়ে বার বার ম্রিয়মান হয়েছে ; সেই মন এইবার একটি সুন্দর আশার দর্প নিয়ে জেগে উঠেছে। অবন্তী সরকারের আশার পথ থেকে যে শেষ বাধা সরে গিয়েছে, সে-কথা এখনও জানে না অবন্তী। যাদবপুরের লেবরেটরির চাকরিটা পেয়েছে নিখিল। আজ অনায়াসে নিজের থেকেই হাত এগিয়ে দিয়ে অবন্তীর হাত ধরে জিজ্ঞেসা করতে পারবে নিখিল—আর দেরি ক'রে লাভ কি অবন্তী ? বাবাকে বল, বিয়ের দিনটা স্থির ক'রে ফেললেই হয়।

এতদিন ধরে নিখিলের যে মাথা একটু হেঁট হয়ে থাকতো, সেই মাথাকেই উঁচু ক'রে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে প্রশ্ন করে নিখিল—কি ভাবছো অবন্তী ?

কল্পনা করতে পারে নিখিল, শোনা মাত্র কত খুশি হয়ে উঠবে অবন্তী, এবং হয়তো একটু বিস্মিত হয়ে, চমকেও উঠবে। আর বুঝতে পেরে ধন্য হয়ে যাবে, তার ভালবাসার মানত এতদিনে সফল হলো।

নিখিলের জীবনের একটা উল্লাস যেন বহুদিনের অভিমান থেকে মুক্ত হয়ে দু'চোখের চাঞ্চল্যের মধ্যে বার বার ছটফট করছে। অবন্তীর উপকার গ্রহণ করে এতদিন যে বিস্ময় সহ্য করেছে নিখিল, এইবার অবন্তীকে সেই বিস্ময় সহ্য করতে হবে। যে-কোন উপকার আর যে-কোন উপহার এইবার অবন্তীর কাছে নিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বলতে পারবে নিখিল—এই নাও অবন্তী, আমার দেওয়া উপহার। অবন্তীকে উপহারে আর উপকারে সুখী করবার ক্ষমতা আজ পেয়েছে নিখিল মজুমদার।

অবন্তী হেসে ফেলে—একটা গর্বের কথা বলবো?

নিখিল—বল।

অবন্তী—আমার গর্ব, আমি যা চেয়েছিলাম, তার সবই পেলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নিজে রোজগার ক'রে বাবা আর ভাইগুলোর জীবনে একটু আনন্দ এনে দেব। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যাকে ভালবাসবো তাকেও…।

নিখিল হাসে—বলেই ফেল, লজ্জা করবার কি আছে?

অবন্তী—তাকেও আমার নিজের মনের মতন তৈরি ক'রে নেব।

নিখিল আশ্চর্য হয়—তার মানে?

অবন্তী—তাকেও বড় ক'রে তুলবো।

নিখিল—এ যে আরও দুর্বোধ্য হয়ে গেল।

অবন্তী হাসে—তার ভাগ্যকেও আমিই বড় ক'রে দিয়েছি। এই আমার গর্ব।

নিখিল—কিছুই বুঝলাম না অবন্তী।

অবন্তী—তোমার এই সার্ভিসটা আমারই চেষ্টায় পেয়েছ, সে খবর তুমি জান না। কোনদিন তোমাকে বলিনি, বলবোও না ভেবেছিলাম। কিন্তু…।

নিখিলের উঁচু মাথার উল্লাস যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। এতক্ষণ মনের ভিতরে উতলা হয়ে ওঠা এত সুন্দর গর্বের বাতাসটা যেন হঠাৎ ধুলোয় ভরে গেল। এ কি বলছে অবন্তী? অবন্তীর

চোখ ছুটো যেন বিজয়িনী জাছুকরীর চোখের মত জ্বলজ্বল করছে। নিখিলের সৌভাগ্য যেন সত্যিই অবন্তীরই একটা কৌতুকের সৃষ্টি।

নিখিল বলে—কি বলছিলে বল।

অবন্তী—কিন্তু আজ আর বলতে বাধা নেই। আমার সব আশা সফল হয়েছে নিখিল। আমার নিজের জীবনের আনন্দ, আমি যাদের ভালবাসি তাদের জীবনের আনন্দ, সবই আমার নিজের হাতের গড়া। আমার মত একটা সাধারণ মেয়ে, এর চেয়ে বেশি আর কোন্ গর্ব আশা করতে পারে বল?

নিখিল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়—আমি সত্যিই কল্পনাও পারিনি, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমার চাকরিটা তোমার চেষ্টায় হয়েছে।

অবন্তী—বিশ্বাস কর নিখিল।

নিখিল—বিশ্বাস করতে চাই, কিন্তু…।

অবন্তী হাসে—হঁ্যা, এর মধ্যে একটা কিন্তু আসছে ঠিকই। সেটাও একটা গল্প।

নিখিল—শুনি।

অবন্তী—এক ভদ্রলোক। বেশ লোক। অদ্ভুতও বলতে পারা যায় সে ভদ্রলোক আমার অনুরোধ ঠেলতে পারেন না।

চুপ করে অবন্তী সরকার। নিখিল মজুমদারের চোখের দৃষ্টি ছুঃসহ কৌতূহলে জ্বলজ্বল করে।—গল্পটা স্পষ্ট ক'রে না বললে কিছুই বুঝতে পারছি না।

অবন্তী—সে ভদ্রলোক খুব কোয়ালিফাইড। সায়েন্সে রিসার্চ স্কলার। আমি যে কাজটা পেয়েছি, সে কাজটার জন্য সেই ভদ্রলোকও প্রার্থী ছিল। কাজটা তারই ভাগ্যে অবধারিত ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে…।

অবন্তী সরকারের মুখের হাসিটা হঠাৎ আরও ছটফট ক'রে বেজে ওঠে—ইণ্টারভিউ-এর দিন সেই ভদ্রলোক আমার অনুরোধে ইণ্টারভিউ না দিয়েই সরে পড়লো।

নিখিল—তারপর ?

অবন্তী—ঠিক এইরকমই কাণ্ড আবার করতে হলো তোমার চাকরিটার জন্য। ঐ ভদ্রলোকই আবার এই কাজটার জন্য দরখাস্ত করেছিল।

চেঁচিয়ে ওঠে নিখিল—শেখর মিত্র ?

অবন্তী—হ্যাঁ। তোমার কাছ থেকে যেদিন শুনলাম যে শেখর মিত্র নামে একজন খুব কোয়ালিফাইড ক্যানডিডেট এই কাজের জন্য চেষ্টা করছে, সেদিন আমিই শেখর মিত্রকে চিঠি দিয়ে ডেকে এনে অনুরোধ করলাম। ভদ্রলোক খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেল। আমার কথায় শেখর মিত্র কাজটা নেয়নি বলেই তুমি পেয়ে গেলে।

নিখিল মজুমদার দু'চোখের নিথর দৃষ্টি দিয়ে যেন গিলে গিলে অবন্তী সরকারের মুখের ঐ হাসি আর এই গল্পের শব্দগুলিকে বুঝবার চেষ্টা করে।

অবন্তী বলে—তুমি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছ বলে মনে হচ্ছে।

নিখিল—একটু নয়, যথেষ্ট আশ্চর্য হচ্ছি।

অবন্তী—কেন ?

নিখিল—দুনিয়াতে এমন বোকা মানুষও আছে।

অবন্তী—তার মানে ?

নিখিল—তার মানে, ঐ শেখর মিত্র, একরকম একেবারে নিঃস্বার্থ পরোপকারী একটা বেকুব।

অবন্তী—হ্যাঁ পরোপকারী বলতে পার, বেকুবও বলতে পার। কিন্তু··· ।

আবার একটা কিন্তু দিয়ে মুখের হাসিটাকে একটু জটিল ক'রে তোলে অবন্তী সরকার।—কিন্তু, ঠিক একবারে নিঃস্বার্থ বলা যায় না।

নিখিল—কেন ?

মুখে রুমাল চাপা দেয় অবন্তী—আর প্রশ্ন করো না নিখিল। উত্তর দিতে বড়ো লজ্জা করবে আমার।

নিখিল মজুমদারের চোখের কৌতূহল এইবার তীক্ষ্ণ হয়ে হাসতে

থাকে।—লজ্জার ব্যাপার আছে তাহলে?
অবন্তী—হ্যাঁ।
নিখিল—কি?
অবন্তী—আমার বিশ্বাস, ভদ্রলোক যেন একটা আশা নিয়ে···যাক, আর বলতে পারবো না নিখিল।
নিখিল গম্ভীর হয়ে বলে—তোমার মুখ দেখে মুগ্ধ হয়েও বোধ হয়?
অবন্তী—হ্যাঁ তাই, তাতে কি আসে যায়? আমার কি দোষ বল?
নিখিল—কেমন যেন অদ্ভুত ভঙ্গীতে কটকট ক'রে হাসতে থাকে—সত্যি কথা। তোমার মুখ দেখে কেউ মুগ্ধ হয়ে যদি পাগল হয়ে যায়, তবে তোমার অপরাধ হবে কেন? ভদ্রলোক নিজের মনের ভুলেই নিজেকে পাগল করেছেন।
চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অবন্তী—আমিই বা সেই পাগলামির সুযোগ নিতে ছেড়ে দেবো কেন?
হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় নিখিল মজুমদার। আনমনা হয়ে চুপ ক'রে কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবতে থাকে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—শেখর মিত্র দেখতে কেমন?
অবন্তী হাসে—দেখতে ভাল বৈকি। দেখতে বেশ চালাকও।
নিখিল—বয়স একটু বেশি হয়েছে বোধহয়।
অবন্তী চেঁচিয়ে ওঠে—না না। তোমার চেয়ে বেশি নয়, বরং একটু কম বলেই মনে হয়।
নিখিল—বাড়ির অবস্থা কেমন?
অবন্তী—সে-সব খবর রাখি না। কিন্তু একটু গরীব বলেই মনে হয়।
নিখিল—আমারও তাই মনে হয়। নইলে পরের উপকার করবার জন্য এরকম মূর্খের মত নিজের ক্ষতি কে আর করে? শক্ত ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলি উচ্চারণ করে নিখিল।
হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় নিখিল মজুমদার—রাত হয়েছে। চলি এবার।
অবন্তী—এমন কিছু রাত হয়নি।
নিখিল—তা ঠিকই; তবে মিউজিক কনফারেন্সের একটা টিকেট

কিনেছি। তাই যেতে হচ্ছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অবন্তী সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করে নিখিল। এবং বোধ হয় ঠিক ভাল ক'রে বলবার মত ভাষা মুখের কাছে পায় না। নিখিলের চোখের চাহনির ভঙ্গী আর তীক্ষ্ণতা আর একবার দপ্ ক'রে হেসে ওঠে। তার পরেই যেন ভয় পাওয়া মানুষের চোখের মত থরথর করে। অবন্তীর ঐ সুন্দর মুখ, কালো চোখ আর চোখের তারার বুদ্ধির দীপ্তি ভয় করবার মত বস্তু নয়. কিন্তু নিখিলের চোখ দুটো সত্যিই যে বড় বেশি ভয় পেয়েছে। থরথর করে নিখিলের ঠোঁট দুটো।

যাবার আগে একটা কথা বলেই ফেলে নিখিল, আর বলে ফেলেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে।—অদ্ভুত গল্প শোনালে অবন্তী। শেখর মিত্র নামে একটা লোক তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে অথচ তুমি তাকে ভালবাস কিনা, সেদিকে তার কোন খেয়ালই নেই।

হ্যাঁ। কথাটা বলে লজ্জা পেয়ে হাসতে থাকে অবন্তীও।

নিখিল বলে—সবচেয়ে অদ্ভুত, আরও মজার কথা, তুমি তাকে ভালবাসতে পারনি।

ভ্রূকুটি করে অবন্তী আবার আমার কথা বারবার টেনে এনে মিছিমিছি কেন···।

নিখিল মজুমদার হাঁটতে শুরু করে, এবং মুখের হাসিটাও যেন না থেমে সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ক'রে চলতে থাকে। অবন্তীর দিকে অদ্ভুত-ভাবে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে কথা শেষ করে নিখিল—সত্যিই শেখর মিত্র একটা অদ্ভুত···।

কথাটা ঠিক শেষ হলো না, কিন্তু চলে গেল নিখিল মজুমদার।

তের

অনসূয়া বলে—আপনি যে আমাদের ভুলেই গিয়েছেন ?

শেখর—কেমন ক'রে বুঝলে ?

অনসূয়া—সেই যে কবে বোনপোর অন্নপ্রাশনের দিনে এসেছিলেন, তারপর এই এতদিন পরে দ্বিতীয় শুভাগমন।

শেখর—একটা শুভ খবরের আঁচ পেলাম এতদিনে, তাই ভাল ক'রে জানতে এসেছি।

অনসূয়া হেসে মুখ ফেরায়। প্রভা এসে বলে—কিন্তু উনি এখন নিজেই শুভ খবরের শত্রু হয়ে উঠেছেন। এখনও পর্যন্ত মন স্থির করতে পারছেন না।

শেখর হাসে—তার মানে।

প্রভা—উনি বলছেন, অজানা অচেনা একটা মানুষকে কেমন ক'রে··· ।

শেখর—ঠিকই তো বলেছে। বেচারা একটু চেনা-জানা না ক'রে একটা কাণ্ড করে ফেলতে রাজি হচ্ছে না, ভালই তো।

অনসূয়া—আপনিই বলুন, আমি বললে আপনার বোন বিশ্বাস করে না।

প্রভা—পাত্র তো বিয়ে করবার জন্য পাগল, কিন্তু উনিই রাজি নন।

শেখর—পাগল হলো কেন ?

প্রভা—গান শুনে। মিউজিক কনফারেন্সে অনসূয়ার ঠুংরি শুনে পাত্রমশাই নিজে যেচে অনেক কষ্ট ক'রে ঠিকানা জোগাড় ক'রে একেবারে ওঁর অপিসে হাজির হয়েছে। পাত্র একেবারে অচেনাও নয়। পাত্রের দাদা ওঁরই সঙ্গে দিনাজপুরের কলেজে এক ক্লাসে পড়তেন।

শেখর—পাত্র কি করে ?

প্রভা—আগে তেমন কিছু করতো না। কিন্তু এখন খুব ভাল একটা সার্ভিস পেয়েছে। মাইনে চার-পাঁচশো টাকার মতো।

শেখর—বাস্, তবে আর অসুবিধার কি আছে? পাত্রের সঙ্গে অনসূয়ার একটু ভাব করিয়ে দাও। ওরা নিজেরাই একটু চেনা-জানা ক'রে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে যাক।

অনসূয়া চেঁচিয়ে ওঠে—কখ্খনো না। ওসব বেহায়াপনা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

শেখর—তাহলে পাত্রকে বলে দিলেই তো হয় যে, মেয়ে রাজি নয়।

প্রভা হাসে—তাতেও রাজি নয় অনসূয়া।

শেখর—তার মানে?

অনসূয়া—মানে খুব সোজা। এত তাড়াতাড়ি করবার কি আছে? দেখাই যাক না, ভদ্রলোকের মন কতদিন পাগল হয়ে থাকতে পারে।

শেখর—তাই বল। ধীরে সুস্থে এগুতে হবে, এই তোমার বক্তব্য।

অনসূয়া—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কোন বক্তব্য তো আজ পর্যন্ত শুনতেই পাওয়া গেল না। একেবারে ফুল স্টপ দেগে বসে আছেন। হাসিঠাট্টার উল্লাসটা যেন শেখর মিত্রের মনের ভেতর গিয়ে হঠাৎ একটা হোঁচট খায়। আনমনার মত চমকে ওঠে শেখর। যেন একটা পুরনো ক্ষতের উপর আঘাত লেগেছে। হ্যাঁ ফুল স্টপ; অনসূয়া জানে না যে, শেখর মিত্রের জীবনে একটা আশার কবিতা হঠাৎ ভাষা হারিয়ে মিলের আগেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। অনসূয়া জানে না, তারই বান্ধবী অবন্তী সরকার এখন একটা নিষ্ঠুর কৌতুকের গল্প হয়ে শেখর মিত্রের স্মৃতির আড়ালে পড়ে আছে।

শেখর জোর করে হাসে—আমার বক্তব্য থাকলেও কোন দিন শুনতে পাবে না।

অনসূয়া—তা জানি, মশাই ডুবে ডুবে জল খেতে খুব ওস্তাদ। যাক···আপাতত চা খান।

চা আনে অনসূয়া। চা খেতে খেতে গল্প করে শেখর। সে-সব গল্প একেবারে ভিন জগতের গল্প। হাইড্রোজেন বোমা থেকে শুরু ক'রে দক্ষিণ মেরুর বরফের রহস্য পর্যন্ত সব কিছুই সেই গল্পের মধ্যে থাকে।

অনসূয়া হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে বলে—আপনি বড় সুন্দর বুঝিয়ে বলতে পারেন। অবন্তীটা আজ এখানে থাকলে এই সব গল্প কত মজা ক'রে শুনতে পেত।

বোধ হয় মনটা একটু অসাবধানে ছিল, তাই বলে ফেলে শেখর—অবন্তী সরকার কবে এসেছিল ?

অনসূয়া—অনেকদিন হলো আসে না। কে জানে ওর কি হয়েছে। মাঝে একদিন মিউজিয়ামের গেটের কাছে আমার সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু, কী অদ্ভুত, খুব গম্ভীর হয়ে আর শুধু কেমন আছ বলেই তড়বড় ক'রে সরে পড়লো।

প্রভাদের বাড়ির চা-এর আসর থেকে উঠে আবার কলকাতার রাতের পথে একা চলতে চলতে শেখর মিত্রের মনের ভিতর নীরব গল্পটা যেন ছটফট ক'রে ওঠে। অবন্তী সরকার গম্ভীর হয়ে গিয়েছে কেন ? ও মেয়ের পক্ষে তো গম্ভীর হওয়া সাজে না।

পথের বাঁক ঘুরতে গিয়ে পিছনের গাড়ির শব্দে চমকে ওঠার পর শেখর মিত্রের মনটাও এই হঠাৎ বিষণ্ণতার ছোঁয়া থেকে মুক্ত হয়ে যেন হেসে হেসে নিজেকেই ঠাট্টা করে, অবন্তী সরকারের কথা ভেবে তোমারও এত গম্ভীর হওয়া আর সাজে না।

চৌদ্দ

পার্ক সার্কাসের মস্ত বড় নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটে সুন্দর করে সাজানো একটি ঘর। সোফার উপর বসে আছে যে সুন্দর মেয়ে, নাম যার অবন্তী সরকার, সে আজ সত্যিই বড় গম্ভীর। দুই কালো চোখের তারায় সেই বুদ্ধির দীপ্তি হঠাৎ বোকা হয়ে গিয়েছে, খুব বেশি চিক-চিক করে না। অফিস থেকে অনেকক্ষণ হলো ফিরে এসেছে অবন্তী সরকার। সারা বাড়িটার জানালায় জানালায় সন্ধ্যার আলো ফুটেছে। অবন্তী সরকারের এই ঘরেও আলো জ্বলে। কিন্তু এই ঘরের সঙ্গে যেন বেশ একটু বেমানান হয়ে বসে আছে অবন্তী

সরকার। এত নীরব, এত স্তব্ধ আর এত গম্ভীর মূর্তি রঙীন কভারে ঢাকা সোফার সঙ্গে ঠিক সাজে না।

শুধু তাই বা কেন? অবন্তী সরকারের ঐ রঙীন সাজের সঙ্গে, গলার হারের লকেটের ঐ পাথরের ঝিকঝিক হাসির সঙ্গে ওর এত গম্ভীর একটা মুখকেও মানায় না।

নিখিল মজুমদার নিশ্চয়ই এখন আর আসবে না। কেন আসবে না, সে রহস্যের কিছুই আজ আর অবন্তী সরকারের অজানা নয়। গত এক মাসের মধ্যে একটি দিন ভুল করেও এখানে আসেনি নিখিল মজুমদার। সেই ভাল সার্ভিসটা পাওয়ার পর থেকে কাজের দায় নিয়ে সারা দিনের অনেকটা সময় ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয় ঠিকই। কিন্তু কাজ শেষ হবার পরেও তো অনেক সময় থাকে। বিশেষ ক'রে এই রকমের এক একটি সন্ধ্যার সময়ে। এর আগে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই ঠিক এইরকমই প্রথম আলো জ্বলবার লগ্নটা এগিয়ে আসতেই নিখিল মজুমদারের মূর্তি এই ঘরের দরজায় দেখা দিয়েছে। হাসিভরা উজ্জ্বল চোখে কৃতার্থতার আনন্দ ভরে নিয়ে এই ঘরের সোফায় বসে অবন্তী সরকারের সঙ্গে গল্প ক'রে চলে গিয়েছে নিখিল। সেই নিখিল কেন এমন উদাস হয়ে গেল, জানতে পেরেছে অবন্তী।

শেষ কবে এসেছিল নিখিল? খুব স্মরণ করতে পারে অবন্তী সরকার। নিখিল মজুমদারের চাকরি হবার প্রথম সপ্তাহের রবিবারের সন্ধ্যায়। তার পর আর নয়। সেই যে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে চেঁচিয়ে আর হেসে হেসে চলে গেল নিখিল, তারপর আসেনি।

নিখিলের সেই অদ্ভুত চাহনি, সেই উচ্চ হাসি, আর সেই ব্যস্ততার অর্থ সেদিন বোঝা যায়নি। কিন্তু আজ বোঝা যায়। নিখিলের আর এই বাড়িতে না আসার রহস্যটা বুঝতে বেশি দেরি হয়নি অবন্তীর। অফিসের টাইপিস্ট চারুবাবুর সামান্য কয়েকটা কথা থেকেই একটা অসামান্য কাহিনীর মর্ম জেনে ফেলেছে অবন্তী।

আজ এতদিন পরে এই ঘরের সোফার উপর বসে গম্ভীর অবন্তী সরকার স্মরণ করে, কী অদ্ভুত মানুষের মন? সেই রাতেই মিউজিক কন্‌ফারেন্সে গিয়ে ঐ নিখিল মজুমদার অনসূয়াকে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। সেই তো নিখিলের চোখে প্রথম অভিশাপ লাগলো। তার জের আজও মেটেনি। অফিসের টাইপিস্ট চারুবাবুর কথায় প্রথম যেটুকু জানতে পেরেছিল অবন্তী, এই কদিনের মধ্যে খোঁজ নিয়ে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু জানতে পেরেছে। মনে পড়ে, চারুবাবু কদিন আগে তাঁর ভাগ্নের নামে যে নতুন গল্পটা বললেন।

ছেলেদের মনের লীলা দেখে মরে যাই মা। আমার সেই ভাগ্নেই কিনা একটা মেয়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, আর তাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

চমকে উঠেছিল অবন্তী—কি বললেন?

চারুবাবু—ভবানীপুরে আমারই বাড়ির পাশে থাকে যে শৈলেশ, তার বোন অনসূয়া নামে মেয়েটি বেশ ভাল গান গাইতে পারে।

অনসূয়া! চেঁচিয়ে ওঠে অবন্তী।

চারুবাবু—তুমি অনসূয়াকে চেন নাকি?

অবন্তী—চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু সে মেয়ে তো রোজগেরে মেয়ে নয়।

চারুবাবু—না, সেই জন্যেই তো আশ্চর্য হচ্ছি। আরও একটা কথা। আমার ভাগ্নে বাবাজি গাইয়ে বাজিয়ে মেয়েদের দস্তুর মত ঘেন্নাই করতো। অথচ দেখ, মাত্র একটিবার গান শুনেই…।

চারুবাবুর কাছ থেকে কথায় কথায় আরও খবর শুনেছে অবন্তী। নিখিলের মা দিনাজপুর থেকে চলে এসেছেন, অনসূয়ার সঙ্গে নিখিলের বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি করবার জন্য।

একদিন চৌরঙ্গীর পথের উপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবন্তী। নিজের চোখেই দেখেছে, অনসূয়ার দাদা শৈলেশবাবু আর নিখিল একই ট্যাক্সি থেকে নেমে সিনেমা হাউসের ভিতরে ঢুকছে। আজ আর

কোন সন্দেহ নেই, কেন নিখিল মজুমদার এই ঘরের দরজার কাছে এসে হেসে হেসে দাঁড়াবার সব দায় ভাল করেই ভুলে গিয়েছে।

নিখিল মজুমদার অবন্তী সরকারের চোখের নাগালে আর আসেনি, কিন্তু অবন্তী সরকার অনেকবার টেলিফোনে নিখিলের নাগাল পেয়েছে। প্রত্যেক বারই অবন্তীর প্রশ্নের উত্তরে নিখিল সেই একই উত্তর দিয়ে কথা শেষ ক'রে দিয়েছে—নানা কাজে বড় ব্যস্ত আছি। একেবারেই সময় পাই না।

কী সুন্দর সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত মিথ্যা! নিখিল মজুমদার কল্পনাও করতে পারে না যে, তার জীবনের নতুন গল্পের অনেক কিছুই অবন্তী সরকারের জানা হয়ে গিয়েছে। তাই অক্লেশে ওভাবে অত সহজ ও সরল একটা মিথ্যা কথাকে অনায়াসে অবন্তী সরকারের কানের উপর ছুঁড়ে দিতে পেরেছে নিখিল। অবন্তী সরকারের চোখের জ্বালা কখনও নীরব ধিক্কার দিয়ে হেসে ওঠে, আবার কখনও বা আরও তপ্ত হয়ে গলে পড়তে চায়।

অনসূয়ার গানের মধ্যে এমন অভিশাপ থাকতে পারে, কোনদিন স্বপ্নেও সন্দেহ করেনি অবন্তী। আর, নিখিল মজুমদার নামে মানুষটা তার মনের মধ্যে এত বড় পাগলামি লুকিয়ে রেখেছিল? অবন্তী সরকারের এত কল্পনা ও চেষ্টার গৌরবে গড়া সুখের জগৎ থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয় একটা গানের জন্য?

অপমানের কামড়টা বুকের পাঁজরে পাঁজরে যেন রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছে। অনসূয়ার গান অবন্তী সরকারের ভালবাসার মানুষকে লুঠ ক'রে নিয়ে গিয়েছে? অবন্তী সরকারের এতবড় আশার স্বপ্ন, সব গর্ব যে ব্যর্থ হতে চললো।

সোফা থেকে স্তব্ধ শরীরটাকে তুলে নিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় অবন্তী। কোলাহলময় পথের ধোঁয়াটে কুহেলিকার দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্নের সঙ্গে যেন মনে মনে সংগ্রাম করে অবন্তী। নিখিল মজুমদারকে ফিরিয়ে আনা যায় না?

চোখের সামনে শুধু ধোঁয়াটে কুহেলিকাই ছিল, ঝকঝকে মিরর নয়।

নইলে নিজের চোখেই নিজের মুখটাকে এখন দেখতে পেয়ে চমকে উঠতো অবন্তী। ঠোঁটের উপর দাঁত বসে গিয়েছে, যেন একটা নতুন প্রতিজ্ঞার উল্লাস নিয়ে মনে মনে খেলা করছে অবন্তী।
ধিকধিক করে চোখের তারা। আর, বারবার মনে পড়ে, শেখর মিত্র নামে একটি মানুষের কথা। আজও ডাকলে কি সে মানুষ না এসে পারবে? অবন্তীর অনুরোধকে ভক্তের মত পুজো করে যে মানুষ, সে কি আবার একটু সাহায্য করবে না? ঐ তো এই পৃথিবীতে এক জন মাত্র মানুষ, যার কাছে অনায়াসে দুঃখের কথা বলে দুঃখ থেকে উদ্ধারের দাবি করতে পেরেছে অবন্তী। সে তো একটা মাটির মানুষ, অবন্তীর উপকার করতে পারলেই ধন্য হয়ে যায়। ঐ একটি মানুষ, যার কাছে অবাধে, বিনা লজ্জায়, অসঙ্কোচে সব কথা বলে দিতে পারে অবন্তী। ঐ একটি লোক; যে ভুল ক'রে মনে মনে অবন্তীকে ভালবেসে বসে আছে।
শেখর মিত্রের বাড়িতে যাবার দরকার নেই। চিঠি দিলেই যথেষ্ট। জানালার কাছ থেকে সরে এসে শেখর মিত্রের কাছে চিঠি লেখে অবন্তী।—আমার বিপদ। বিশ্বাস আছে, এই খবর শুনে নিশ্চয় একবার আসবেন।

পনর

বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছে অনসূয়া এবং ভাবতে একটু অস্বস্তিও বোধ করে। নিখিল মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক সত্যিই যে পাগলের মত কাণ্ড করছেন। এরই মধ্যে অনসূয়াকে সাতটা চিঠি লিখে ফেলেছে নিখিল মজুমদার। সব চিঠির বক্তব্য প্রায় একই। যদিও তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ চেনা-শোনা নেই, যদিও আমার পরিচয় তুমি অনেক কিছুই জান না, এবং তোমার পরিচয়ও আমি অনেক কিছু জানি না, তবু সেটা কি এমন কোন বাধা যে আমাদের বিয়েই হতে পারে না? একেবারে সব জেনে-শুনে আপন হওয়া

যায়, আবার একেবারে আপন হয়ে নিয়ে তারপর সব জানা-শোনা যায়, এই দুটোই কি সত্য নয়? আপন হবার পরেও কে কার জীবনের সবটুকু জানতে পারে অনসূয়া? আপন হবার আগে তো প্রায় কিছুই জানা যায় না। তুমি শত চেষ্টা ক'রে, এক বছর ধরে অপেক্ষা ক'রে, আর আমাকে চোখে দেখে ও আমার কথা শুনে আমাকে কতটুকুই বুঝতে আর চিনতে পারবে? একটু অজানা এবং কিছুটা না-বোঝা না থাকলে আপন হবার আনন্দ যে মধুর হয় না অনসূয়া।

নিখিলের চিঠি পড়তে খারাপ লাগে না, কথাগুলিকে অবিশ্বাসও করে না অনসূয়া, এবং কথাগুলির মধ্যে কোন ভুল আছে বলেও মনে হয় না। চোখে দেখে আর কথা শুনে মানুষকে কতটুকুই বা চেনা যায়?

ঘরের ভিতর একলা বসে অনেকদিন অনেকবার অনেকক্ষণ ধরে এই ভাবনা অনসূয়াও ভেবেছে। আর, গম্ভীর মুখটাকে বার বার আঁচল দিয়ে মুছে নিজের মনকেও প্রশ্ন করেছে—কই, প্রভা বৌদির দাদা শেখর মিত্র মানুষটাকে এতদিন ধরে দেখে শুনেও চিনতে পারা গেল কি?

একটা চেনা চিনতে পারা গিয়েছে ঠিকই; মানুষটা যেন নিখুঁত মানুষ। মনের ভুলেও কোন মানুষকে বোধ হয় একটা টোকা দিয়ে দুঃখ দিতে পারে না শেখর মিত্র। নিজের দুঃখটাকে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখে, আর পরের দুঃখটাকে হাসিয়ে দেবার জন্য সব সময় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু সে চেনা নয়। শেখর মিত্রের মনের ভিতরে কোন ইচ্ছা কি লুকিয়ে নেই? অনসূয়াকে কি শুধু বোনের ননদ বলে মনে করে শেখর মিত্র, তার বেশি কিছু মনে করতে ইচ্ছা করে না?

সকলেই নিখিল মজুমদার নয়। সকলেই মুখ দেখে কিংবা গান শুনে পাগল হয়ে ওঠে না, আর পর পর সাতটা চিঠি লিখে ভালবাসার আশা জানিয়ে দিতে পারে না এমন মানুষও আছে

নিশ্চয়, যে তার ভালবাসার আশা আর ইচ্ছাটাকেই সব চেয়ে নীরব ক'রে দিয়ে বুকের গভীরে লুকিয়ে রাখে, আর শত আঘাতেও মুখ খুলে সে আশা ও ইচ্ছাটাকে মুখর ক'রে বাজিয়ে দিতে পারে না। শেখর মিত্র যদি এইরকমই নীরব মনের মানুষ হয়ে থাকে, তবে?

এই একটা প্রশ্ন? অনসূয়ার জীবনের একটা বড় কঠিন প্রশ্ন। শুধু জানতে চায় অনসূয়া, প্রভা বৌদির দাদার মনে অনসূয়া নামে কোন মেয়ের নাম কোন ভাবনা ব্যাকুল ক'রে তোলে না। শেখর মিত্র আসে, হাসে, কথা বলে আর চলে যায়—এই মাত্র। এর মধ্যে আর কোন ইচ্ছার ছায়া নেই।

এই প্রশ্নের উত্তর আজও পায়নি অনসূয়া, এবং পায়নি বলেই বোধ হয় নিখিল মজুমদারের চিঠির উত্তরে আজ পর্যন্ত একটি চিঠিও লিখতে পারেনি অনসূয়া। প্রভা কতবার জিজ্ঞেসা করেছে, কিন্তু নিখিল মজুমদারের ইচ্ছাটাকে মেনে নেবার জন্য মাথা নেড়ে একটা সুস্পষ্ট 'হ্যাঁ' জানাতে পারেনি; অথচ 'না বলে সব প্রশ্ন থামিয়ে দিতে পারেনি।

অস্বীকার করে না অনসূয়া, এবং নিজের চিন্তার ভাষাটাকে বেশ স্পষ্ট বুঝতেও পারে। নিখিল মজুমদারকে বিয়ে করতে কোন আপত্তি নেই; শুধু যদি জানতে পারে অনসূয়া, এই বিয়ে শেখর মিত্র নামে একটা মানুষের মনের কোন নীরব আশাকে ব্যথিত ক'রে তুলবে না।

নিখিল মজুমদারের চিঠির মধ্যে আর একটা বড় সুন্দর কথা লেখা আছে। একেবারে অকপট মনের আবেগ নিয়ে স্বচ্ছন্দে লিখেছে নিখিল মজুমদার তুমি কি কাউকে ভালবাস? এবং তোমাকেও সে ভালবাসে? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু বলবার নেই। আমি খুশি হয়ে তোমার কথা ভুলে যাব।

শেখর মিত্রকে ভালবেসেছে অনসূয়া, একথা বললে বেশি বলা হয়ে যায়। তাই যদি হতো, তবে অনসূয়া এতদিন চুপ ক'রে থাকতো না। মানুষটাকে ভাল লাগে, এর বেশি কিছু নয়। এবং এটাও

সত্য যে, শেখর মিত্রকে ভালবাসবার সাহস পেত অনসূয়া, যদি কোন মুহূর্তে বিশ্বাস করতে পারতো যে, শেখর মিত্র অনসূয়াকে সত্যিই ভালবাসতে চায়। কিন্তু এমন উপলব্ধির মুহূর্ত অনসূয়ার জীবনে কোন দিন কোন বিস্ময় নিয়ে সত্য হয়ে ওঠেনি।

আরও একটা অদ্ভুত কথা আছে নিখিল মজুমদারের চিঠিতে। লেখাটা যেন খুব ভয়ে-ভয়ে আর বড় বেশি করুণ হয়ে মানুষের ভাগ্যের অদ্ভুত একটা জটিলতার বেদনা বলে দিতে চেষ্টা করেছে।—এমন যদি হ'য়ে থাকে অনসূয়া, তোমাকে কেউ একজন ভালবাসে, অথচ তুমি তাকে ভালবাসো না, তবে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হওয়া তোমার উচিত কিনা, সেটা তুমি ভেবে দেখবে। কিন্তু আমি রাজি হয়েই আছি। অনসূয়ার চিন্তার সমস্যাটাকে খুব সরল ক'রে দিয়েছে নিখিল মজুমদারের চিঠি। ঠিকই তো, একবার লজ্জার মাথা খেয়ে শেখর মিত্রের মনটাকে যাচাই ক'রে নিলেই তো হয়। যদি শেখর মিত্রের মনে অনসূয়া নামে একটা ভাবনা থেকে থাকে, আর সে ভাবনার মধ্যে ভালবাসবার ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে অনসূয়ার কর্তব্য সোজা ও সরল হয়ে যায়। হয়, শেখর মিত্রের ভালবাসার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য ক'রে নিখিল মজুমদারকে বিয়ে করতে হবে; নয়, নিখিল মজুমদারের ভালবাসার দাবি তুচ্ছ ক'রে শেখর মিত্রকেই বিয়ে করতে হবে। ভাগ্যি ভাল, অনসূয়ার পঁচিশ বছর বয়সের মন নিজে সাধ ক'রে এই পৃথিবীর কাউকে ভালবেসে অন্ধ হয়ে যায়নি। তাই ভালবাসবার জন্য এগিয়ে যাবার পথটা এখনও সোজা ও সরল আছে।

এইবার একটা কলম হাতে তুলে নিতে পারে অনসূয়া এবং একটা চিঠিও লিখে ফেলে। কিন্তু নিখিল মজুমদারকে নয়; নিখিলকে চিঠি লিখে উত্তর দিতে আরও একটু দেরি করতে হবে। প্রভা বৌদির দাদা শেখর মিত্রকেই চিঠি লেখে অনসূয়া।—আপনি একদিন আসুন। কেন আসতে বলছি সে-কথা এই চিঠিতেই জানিয়ে দিচ্ছি। উত্তরটা তৈরী ক'রে নিয়ে আসবেন। আমার প্রশ্ন, হঠাৎ আমার গান শুনে খুশি হয়েছেন যে ভদ্রলোক; তাঁকে বিয়ে করা আমার উচিত হবে কি? আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

ষোল

শৈলেশের হাতে একটা চিঠি। চিঠি দিয়েছে নিখিল, আজই সন্ধ্যার সময় এখানে আসবে নিখিল।

প্রভা মুখ টিপে হাসে—পীরিতের দায়। বড় অস্থির হয়ে উঠেছে বেচারা।

শৈলেশ একটু বিরক্ত ভাবে বলে—কিন্তু অনসূয়া এরকম করছে কেন? হ্যাঁ কিংবা না, একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বলে দিলেই তো হয়।

প্রভা আবার মুখ টিপে হাসে—দাদা যে পরামর্শটা দিয়ে গেলেন, সেটা তুচ্ছ করছো কেন?

শৈলেশ—কিসের পরামর্শ?

প্রভা—অনসূয়ার সঙ্গে নিখিলবাবুর একটু ভাব-সাব হবার সুযোগ ঘটিয়ে দাও। নিজেরাই আলাপ ক'রে যতটুকু পারে তুজনকে বুঝে নিক। শুধু অনসূয়াকে গোঁয়ার বলে বকা দিয়ে লাভ কি?

শৈলেশ—তাহ'লে কি করা যায়? তুমিই একটা পরামর্শ দাও।

প্রভা হাসে—চল, আজ সন্ধ্যায় আমরা তুজন বাইরে চলে যাই, সিনেমায় কিংবা গড়পারের মাধুরীদির বাড়িতে।

শৈলেশ—তা'তে কি হবে?

প্রভা—নিখিলবাবু সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসে অনসূয়াকে একা দেখতে পেয়ে······।

খিলখিল ক'রে হেসে উঠে প্রভা তার পরিকল্পনার কৌতুকে ছটফট ক'রে ওঠে।—তার পর দাদার পরামর্শটাই সত্যি হয়ে যাবে। তোমার গোঁয়ার বোনের ভয় ভেঙ্গে যাবে, আর ভাবসাব হয়েও যাবে।

সন্ধ্যা হবার আগেই যখন শৈলেশ আর প্রভা সিনেমার ছবি দেখতে চলে গেল, তখন একটু আশ্চর্য হলেও তার মধ্যে কোন চক্রান্ত আছে বলে সন্দেহ করতে পারেনি অনসূয়া। কিন্তু সন্দেহটা

একেবারে একটা ভয়ার্ত শিহর তুলে চমকে উঠলো তখন, যখন ঘরের দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে তাকাতেই অচেনা এক ভদ্রলোকের মূর্তি চোখে পড়লো।

ভদ্রলোক বলেন—শৈলেশবাবুকে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি জানেন, আজ আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবো।

অনসূয়া—শৈলেশবাবু বাড়িতে নেই।

ভদ্রলোক—তিনি কি আপনার দাদা ?

অনসূয়া—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক—আমি নিখিল।

চমকে, মাথা হেঁট ক'রে আর মুখ ঘুরিয়ে অনসূয়া বলে—বসুন।

চেয়ারে বসেই নিখিল বলে—কিন্তু তাই বলে তুমি উঠে যেও না। সত্যি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল অনসূয়া। নিখিল বলে—বসো অনসূয়া।

চেয়ারে বসেই বুঝতে পারে অনসূয়া দাদা আর বৌদির সিনেমার ছবি দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটা কত বড় একটা চক্রান্ত।

নিখিল বলে—আমি আগে জানতুম না যে, আমার মেজদা আর তোমার দাদা শৈলেশবাবু দিনাজপুর কলেজে এক ক্লাসের বন্ধু ছিলেন। অনসূয়া—হ্যাঁ, আমরা সবাই তখন দিনাজপুরে ছিলাম। তখন বাবাও ছিলেন।

নিখিল হাসে—তা'হলে হয়তো আজ এই প্রথম নয়, তোমাকে অনেকদিন আগেই দেখেছি।

অনসূয়া হাসে—হতে পারে।

নিখিল—তোমার গানও তখন শুনেছি বোধ হয়।

অনসূয়া মুখ ফিরিয়ে হাসে—হতে পারে।

গভীর কৌতূহলের আবেগে চোখ দুটোকে হঠাৎ অপলক ক'রে অনসূয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন দেখতে থাকে নিখিল। স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কি-যেন খুঁজছে। তার পরেই ব্যস্ত-ভাবে প্রশ্ন করে—আচ্ছা, দিনাজপুরে থাকতে তুমি কখনও অভিনয়

করেছিলে ?

চমকে ওঠে অনসূয়া—হ্যাঁ, একবার স্কুলের প্রাইজের দিনে অভিনয়ে একটা পার্ট নিয়েছিলাম।

নিখিল—জনা সেজেছিলে তুমি !

আর একবার আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে অনসূয়া—হ্যাঁ, কিন্তু কি ক'রে বুঝলেন আপনি !

নিখিল—সবই মনে আছে, তাই বুঝতে অসুবিধা হলো না।

বিব্রতভাবে তাকায় অনসূয়া, এবং চোখের চাহনিতে একটা ভীরু-ভীরু কাঁপুনিও ফুটে ওঠে।—কি মনে আছে ?

নিখিল—জনার সেই মুখটা।···তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার মনে আছে।

অনসূয়া আর কোন প্রশ্ন করে না। বরং বুকের ভিতরে একটা অস্বস্তির চাঞ্চল্য লুকিয়ে চুপ ক'রে শুধু নিখিলের স্মৃতির ইতিহাস শোনবার জন্য প্রস্তুত হবার চেষ্টা করে।

নিখিল হাসে—জনার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে একটা ছেলে জনাকে আরও ভাল ক'রে দেখবার জন্য সেই থিয়েটার ঘরের পিছনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, মনে পড়ছে তো ?

কোন উত্তর দেয় না অনসূয়া।

নিখিল বলে—অভিনয় শেষ হবার পর বাড়ি যাবার জন্য জনা যখন থিয়েটার ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে স্কুলের গাড়িতে উঠতে যাবে, ঠিক তখন··· ।

অনসূয়া হঠাৎ বিরক্ত হয়ে এবং বেশ একটু রুক্ষ স্বরে বলে ওঠে। —একটা পুরনো ঘটনাকে আপনার এত খুশি হয়ে বলবার কোন দরকার ছিল না।

হেসে ফেলে নিখিল—তাহলে নিশ্চয় তোমার মনে আছে, সেই ছেলেটা জনার কাছে এগিয়ে এসে বেফাঁস যে কথাটা হঠাৎ বলে ফেলেছিল।

অনসূয়া নীরবে শুধু শুনতে থাকে, কোন উত্তর দেয় না, এবং চোখের

চাহনিতে সেই বিরক্তির ছায়াটা কাঁপতে থাকে।

নিখিল বলে—জনা কিন্তু রাগ করেনি; ছেলেটাকে ধমক দিতেও পারে নি। শুধু আশ্চর্য হয়ে একবার তাকিয়েছিল জনা, কাজল বোলানো সেই ছুটি বড়-বড় চোখ তুলে।

অনসূয়া—তের বছর বয়সের জনার পক্ষে সেটা কোন অপরাধ নয়। ও বয়সের চোখ একটুতেই আশ্চর্য হয়।

কিন্তু নিখিল মজুমদারের হাসিটা যেন মাত্রা ছাড়া রকমের বেহায়ার মত আরও মুখর হয়ে ওঠে।—আমিও তো তাই বলছি। আসল অপরাধী ছিল ছেলেটা।

অনসূয়া বলে—দাদা আর বউদির বাড়ি ফিরতে বোধহয় বেশ দেরি হবে।

নিখিল—তা জানি।···কিন্তু সেই অপরাধী ছেলেটার মুখটা কি তোমার একটুও মনে পড়ে না?

অনসূয়া—কি বললেন?

নিখিল—সেই অপরাধী মুখটাকে আজ দেখলে সত্যিই চিনতে পারবে কি?

নিখিলের মুখের দিকে অপলক চোখের কৌতূহল তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অনসূয়া, এবং তার পরেই লজ্জা পেয়ে শিউরে ওঠে। আঁচল তুলে মুখ ঢাকা দিয়ে হেসে ফেলে অনসূয়া।

নিখিল—অপরাধীকে চিনতে পারলে তো অনসূয়া?

অনসূয়া—ওসব কথা থাক্, আপনি এখন আমাকে রেহাই দিন।

নিখিল—তার মানে? প্রশ্নটাই যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় নিখিল, এবং অনসূয়ার মুখের হাসির দিকে আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে থাকে।

অনসূয়ার মুখের ধূর্ত হাসিটা এইবার কোমল হয়ে যায়।—তার মানে, সত্যিই আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকুন, আমি চা নিয়ে আসছি।

নিখিল—তুমি বসো অনসূয়া, চা-এর জন্য আমি মোটেই ব্যস্ত নই।

আমি কিসের জন্য ব্যস্ত, সেটা তোমার অজানা নয়।

অনসূয়ার পঁচিশ বছর বয়সের শক্ত সতর্ক মনের ভাষা এইবার সত্যিই লজ্জায় বিপন্ন হয়ে ওঠে, এবং সেই লজ্জার মধ্যে যেন একটু করুণতাও আছে। নিখিল মজুমদারকে 'না' বলে দেবার জন্য অনসূয়ার মনে কোন প্রতিজ্ঞা নেই। অথচ হ্যাঁ বলে রাজি হবার জন্যও মনটা তৈরী হয়নি।

অনসূয়া বলে– আপনি কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নিখিলবাবু?

নিখিল–যে ভালবাসে সে ব্যস্ত না হয়ে পারে না অনসূয়া।

আনমনার মত অন্য দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবতে থাকে অনসূয়া। রাগ হয় নিজেরই উপর। শেখরবাবুকে ওরকম প্রশ্ন ক'রে একটা চিঠি না লিখলেই ভাল ছিল।

নিখিল– আমার এতগুলি চিঠির একটিরও উত্তর তুমি দাওনি। সেজন্য দুঃখ করি না। আমি শুধু জানতে চাই, সত্যিই কি তুমি···।

অনসূয়া বলে–আর মাত্র দু'টি দিনের মত আমার অভদ্রতা সহ্য করুন নিখিলবাবু।

নিখিল—কি বললে?

অনসূয়া—মাত্র আর দু'টি দিন আমাকে সময় দিন, তার পরেই জানতে পারবেন।

নিখিলের গম্ভীর মুখ আশ্বস্ত হয়ে হেসে ওঠে না, বরং যেন একটা সন্দেহের বেদনায় মেদুর হয়ে ওঠে। নিখিল বলে—কিছু মনে করো না অনসূয়া, একটা কথা বলছি।

অনসূয়া—বলুন।

নিখিল—আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমি বোধ হয় তোমার ওপর একটা অন্যায় দাবি ক'রে ফেলেছি?

অনসূয়া ভীতভাবে বলে—কেন এরকম মনে করেছেন?

নিখিল—মনে হচ্ছে, তোমার কোন অসুবিধা আছে; হয়তো তুমি আর কাউকে···।

অনসূয়া গম্ভীর হয়ে বলে—না নিখিলবাব।

নিখিল—কিন্তু তোমাকেও কি আর কেউ···।

অনসূয়া—না, আপনি ছাড়া আর কেউ নয়। অন্তত আমি জানি না, আর কেউ আমার মত একটা সস্তা মেয়েকে যদি মনে মনে··· জানি না, এরকম কাণ্ড সত্যিই মানুষের জীবনে সম্ভব কিনা।

নিখিল—সম্ভব হয় অনসূয়া।

অনসূয়া—কেমন ক'রে বুঝলেন ?

নিখিল—নিজের চোখে এমন কাণ্ড সম্ভব হতে দেখেছি।

অনসূয়া হাসে—নিজের জীবনে নয় তো ?

নিখিল—না, শেখর মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের জীবনে।

—কি বললেন ? কা'র জীবনে ? প্রশ্ন করতে গিয়ে থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে অনসূয়ার গলার স্বর।

নিখিল—শেখর মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের জীবনে। সে এক অদ্ভুত মানুষ।

অনসূয়া—কি কাণ্ড করেছে সে ভদ্রলোক ?

নিখিল—একজনকে সে ভালবাসে। শুধু ভালবাসে বললে সব কথা বলা হয় না। কবির লেখায় পড়েছিলাম···সাধু কহে শুন মেঘ বরিষার, নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার। ব্যাপারটা সেইরকমই। শেখর মিত্র সত্যিই একেবারে নিজেরে নাশিয়া এক মেয়েকে ভালবাসে। তার মানে, ভালবাসতে গিয়ে নিজেকে যে কি-ভয়ানক নাশ ক'রে ফেলছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

অনসূয়া—সে মেয়ের নামধামের খবর বোধ হয় আপনি জানেন না ?

নিখিল—জানি বৈকি। ভাল মাইনের চাকরি করে সেই মেয়ে ; তার নাম অবন্তী সরকার।

অনসূয়া চমকে উঠতেই নিখিল সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে—অবন্তীকে তুমিও চেন নাকি ?

অনসূয়া বলে—চিনি।

নিখিল আশ্চর্য হয়—শেখর মিত্রকেও চেন ?

অনসূয়া—হ্যাঁ। আমার বউদির দাদা হন তিনি।

নিখিল—কি আশ্চর্য!

নিখিলের চোখে শুধু একটা খবর শোনার আশ্চর্য থমথম করে। কিন্তু অনসূয়ার মনের গভীরে একটা ভয়ানক লজ্জার আশ্চর্য সেই মুহূর্তে একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। কি ভয়ানক ভুল! মাথামুণ্ড নেই! একটা কল্পনার ভুলে শেখর মিত্রের কাছে একটা চিঠি লিখে ফেলেছে অনসূয়া। অবন্তীকে ভালবাসে শেখর মিত্র; শেখর মিত্রের মনে আর কোন মেয়ের ছবি নেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অনসূয়া। —আমি এইবার চা নিয়ে আসি নিখিলবাবু। ততক্ষণ আপনি···।

নিখিল হাসে—বল, কি করবো?

অনসূয়া—ততক্ষণ আমাকে আর সন্দেহ না ক'রে মনে মনে তৈরী ক'রে রাখুন, দাদাকে কি বলবেন।

নিখিল—তুমি যা বলেছ, তাই বলবো।

অনসূয়া–কি বলেছি আমি?

নিখিল–মাত্র আর ছুটো দিন পরে তুমি স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেবে যে···।

অনসূয়া—না, আপনি আজই দাদাকে বলতে পারেন।

চেয়ার থেকে উঠে অনসূয়ার কাছে এসে অনসূয়ার একটা হাত ব্যাকুলভাবে কাছে টেনে নেয় নিখিল–অনসূয়া! স্পষ্ট ক'রে বল।

অনসূয়া বলে—হ্যাঁ।

অনসূয়ার চিঠি। চিঠিটা পড়ে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারে না শেখর। অনসূয়া কোন দিন শেখরের কাছে চিঠি লেখেনি, শেখরও না। অনসূয়ার জীবনের কোন প্রয়োজনে শেখরের ডাক আসতে পারে, এরকম কোন ধারণাও কোনদিন শেখরের মনে ছিল না। অনসূয়ার বিয়ে হবে, অনসূয়াকে বিয়ে করবার জন্য এক ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভালই তো, অনসূয়ার যদি আপত্তি না থাকে, তবে হয়ে যাক্ এই বিয়ে। এর মধ্যে শেখর মিত্রের আপত্তি করবার কি আছে? শেখর মিত্রের পরামর্শেরই বা দরকার কি?

বার বার কয়েকবার অনসূয়ার চিঠিটা পড়ে শেখর। পড়তে পড়তে অনসূয়ার মুখের উপর সেই সব সময় শিউরে থাকা এক টুকরো সুন্দর হাসির ছলটাও মনে পড়ে। অনসূয়ার মনটাও সত্যিই একেবারে সাদা, ভালবাসাবাসি নিয়ে কোন ঝঞ্ঝাট কোনদিন অনসূয়ার জীবনে ঘটেছে বলে মনে হয় না। একজন ভালমানুষের জীবনের সঙ্গিনী হয়ে হেসে হেসে জীবনটাকে ভালভাবে কাটিয়ে দিতে চায়, এর চেয়ে বড় কোন আকাঙ্ক্ষা অনসূয়ার নেই, একথা প্রভার মুখে অনেকবার শুনেছে শেখর।

শেখর মিত্রের সামনেই অনসূয়াকে কতবার ঠাট্টা করেছে প্রভা। অনসূয়ার ভয়টা কিসের জান দাদা? ওর ধারণা, ওকে কেউ ভালবাসতে পারবে না। যিনি স্বামী হবেন, তিনিও না। অনসূয়ার যুক্তি; একটা অজানা লোকের কাছে অপমান ভোগ করবার জন্য বিয়ে করবার দরকার হয় না। তার চেয়ে বিয়ে না হওয়াই ভাল। অনসূয়ার এই ভয়টা সত্যি কোন নকল ভয় নয়। এবং প্রভা ঠাট্টা ক'রে বললেও কথাটা মিথ্যে নয়। বিয়ে করবে না বলে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে এতদিন পার ক'রে দিয়ে এসেছে, একটা মেয়ে স্কুলে চাকরি নেবার জন্যও তৈরী হয়েছিল অনসূয়া। কিন্তু···ভাবতে গিয়ে শেখরও মনে মনে হেসে ফেলে। এক ভদ্রলোক অনসূয়ার গান

শুনে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, খবরটা শুনতে পেয়েই বেচারার বিয়ে না করবার প্রতিজ্ঞাটা ভেঙ্গে গিয়েছে। ভয়টাও বোধ হয় ভেঙ্গে গিয়েছে।

তবু কেমন যেন খট্‌কা লাগে। নিজের দাদা থাকতে বউদির দাদার কাছে পরামর্শ চায় কেন অনসূয়া? হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, শেখর মিত্রকে খুব বেশি শ্রদ্ধা করে অনসূয়া। এবং শেখর সুখী হোক্, এরকম একটা শুভেচ্ছার ভাষাও প্রায়ই অনসূয়ার কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। নিজের কানেই শুনেছে শেখর, প্রভাকে জিজ্ঞাসা করছিল অনসূয়া, শেখরবাবুর একটা ভাল কাজটাজ এখনও হলো না কেন বউদি?

—হলো না। হচ্ছে না। কপালের লিখন, নইলে আমার দাদার মত মানুষকে এত কষ্ট সহ্য করতে হবে কেন?

অনসূয়া চিন্তিতভাবে বলে—আমার মনে হয়, শেখরবাবুই গা লাগিয়ে কোন চেষ্টা করেন না। ভদ্রলোক কেমন যেন উদাস হয়ে রয়েছেন।

প্রভা বলে—তুমি ভুল বুঝেছ অনসূয়া। একটা ভাল চাকরির জন্য দাদা চেষ্টা ক'রে ক'রে হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

শেখরের জন্য অনসূয়ার শুভেচ্ছার আরও কথা অনসূয়ার মুখে নিজেই শুনতে পেয়েছে শেখর। সে শুভেচ্ছা শেখরের জীবনের একটা উৎসবের বাসর দেখবার ইচ্ছা। এবং সেই শুভেচ্ছার কথা বলতে গিয়ে অনসূয়ার মুখের ভাষার লাগাম যেন ভেঙ্গে যায়।—শুনেছি কত সুন্দর সুন্দর শিক্ষিত মেয়ে মনের মত স্বামী পাওয়ার জন্য ছটফট করছে, কিন্তু আমি বলি বউদি, তোমার এই দাদা ভদ্রলোক কি তাদের কারও চোখে পড়ে না?

প্রভা বলে—দাদা সামনে রয়েছেন, তা না হলে তোমাকে এখনি একটা কথা বলতে পারতাম অনসূয়া, যে-কথা শুনলে নিজেই জব্দ হয়ে যেতে।

অনসূয়ার সঙ্গে শেখর মিত্রের ঠাট্টার সম্পর্কটা হাসাহাসির মধ্যেই

শেষ হয়ে যায়, সম্পর্ক কোন দিন কোন গম্ভীর চিন্তার ঘনঘটা সৃষ্টি করেনি। অনসূয়ার মত মেয়ের সঙ্গে যদি শেখর মিত্রের বিয়ে হতো, তবে শেখর মিত্রের জীবন অসুখী হতো না নিশ্চয়। কিন্তু অনসূয়ার সঙ্গে শেখরের বিয়ে হোক্ এমন কোন ইচ্ছার চেষ্টা কারও মনে এবং কোন ঘটনায় সত্য হয়ে ওঠেনি। বিয়ে হতে পারে, এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দু'জনের মনের কোন ভাবনার মধ্যে ফুটে ওঠেনি। অনসূয়া চায়, পৃথিবীর কোন ভাল মেয়েকে বিয়ে ক'রে সুখী হোক শেখর মিত্র। এবং শেখর চায়, পৃথিবীর কোন ভাল ভদ্রলোককে বিয়ে ক'রে সুখী হোক অনসূয়া। এই মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। অনসূয়ার চিঠিটা আর একবার পড়ে নিয়েই মনে মনে তৈরী হয় শেখর, আজই সন্ধ্যায়, রতনবাবুর ছেলেকে অঙ্ক শেখাবার পালা একটু তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে দিয়ে ভবানীপুরে যেতে হবে। আর, একেবারে মন খুলে, চেঁচিয়ে হেসে হেসে অনসূয়াকে বলে দিতে হবে।—খুব ভাল কথা অনসূয়া। শুনে সুখী হলাম। আর একটুও দেরি না ক'রে বিয়েটা ক'রে ফেল দেখি।

আর একটা চিঠি। সে চিঠি হাতে তুলে নিয়েই বুঝতে পারে শেখর, অনসূয়ার চিঠি নয়, এবং ঠিক অনসূয়ার মত মনের কোন মেয়ের লেখা এই চিঠি নয়। লেখাটা চেনা, মর্মে মর্মে চেনা। অবন্তী সরকারের চিঠি। চিঠি দেখে যতটা আশ্চর্য হয়, চিঠি পড়ে তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়। আবার আহ্বান জানিয়েছে অবন্তী, কারণ আবার অবন্তী সরকারের জীবন একটা সমস্যার বেদনায় অসুখী হয়ে উঠেছে। কিসের সমস্যা? কল্পনা করতে পারে না শেখর। কিন্তু যে সমস্যার বেদনা দেখা দিক না কেন, অবন্তী সরকারের এই লজ্জাহীন মিনতির কি অন্ত হবে না কোনদিন? নিখিল মজুমদারকে ভালবেসে মুগ্ধ হয়ে আছে যে নারীর জীবন, সে নারীর তার ভাগ্য গড়বার খেলায় শেখর মিত্রকে বারবার আহ্বান করবে, কি ভয়ানক কৌতুকিনী হয়ে উঠেছে অবন্তী সরকার। মনে মনে একটা ধিক্কার দিয়ে চিঠিটা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ শেখর মিত্রের মন, এবং সেই সঙ্গে হাতটাও যেন

সব কঠোরতা হারিয়ে আবার শিথিল হয়ে যায়। ধিক্কার দিতে পারে না, মনের রূঢ় ভাষাটাকে হঠাৎ সামলে নেয়; এবং চিঠিটা বন্ধও করে না; অলস হাতটা যেন অদ্ভুত এক মায়ার আবেশে কোমল হয়ে চিঠিটাকে আর একবার আস্তে আস্তে খোলে, এবং চোখের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়ে লেখাটা পড়তে থাকে শেখর।

বিপদ? বিপদে পড়েছে অবন্তী। বিপদে পড়ে এই পৃথিবীর মধ্যে বেছে বেছে শুধু একজনেরই কাছে, শেখর মিত্রের কাছে রক্ষার আবেদন জানিয়েছে অবন্তী। অবন্তীর চোখের জলে আর মুখের হাসিতে যে ছলনাই থাকুক না কেন, অবন্তীর এই বিশ্বাস যে শেখর মিত্রের জীবনের একটা গৌরবের স্বীকৃতি। বিশ্বাস করে অবন্তী, তাকে বিপদের ভয় থেকে মুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করবার কোন মানুষ পৃথিবীতে যদি থেকে থাকে, সে হলো শেখর মিত্র। অবন্তীর চিঠিকে তুচ্ছ করলে নিজেকেই যে ছোট করে ফেলা হয়।

তবে? তবে আজ সন্ধ্যায় ভবানীপুরে আর যাওয়া হবে না। পার্ক স্ট্রীটের সেই নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটে সুন্দর করে সাজানো ঘরে অবন্তী সরকারের জীবন কোন্ বিপদের বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে, একবার শুধু দেখে আসতে দোষ কি?

আঠার

অবন্তী বলে—আমার বিশ্বাস ছিল, আমার চিঠি পেয়ে আপনি নিশ্চয় আসবেন।

শেখর—আমার কিন্তু বিশ্বাস ছিল না যে, তোমার চিঠি আবার কখনও পেতে হবে, আর আমিও আবার কখনও এখানে আসতে পারবো।

অবন্তী—একটা বিপদে পড়ে আপনাকে ডেকেছি।

শেখর—কিসের বিপদ?

অবন্তী—বড় অপমান শেখরবাবু। কোন দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি

যে, আমাকে এমন অপমানের মধ্যে পড়তে হবে।

শেখর—কিসের অপমান ?

অবন্তী—আমারই অদৃষ্টের। তাই আপনাকে ডেকেছি।

শেখর—আমি তোমার অপমান দূর ক'রে দিতে পারি, এ বিশ্বাস তুমি কোথায় পেলে ?

অবন্তী—হ্যাঁ, বিশ্বাস আছে ; আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

শেখর—তাহলে বল।

অবন্তী—আপনি কি অনসূয়াকে বিয়ে করতে পারেন না ?

শেখরের চোখের দৃষ্টি চমকে ওঠে—একি অদ্ভুত অনুরোধ ?

অবন্তীর চোখ ছল ছল করে—হ্যাঁ শেখরবাবু। কোন উপায় না দেখে শেষে আপনাকে এই অদ্ভুত অনুরোধ করতে হচ্ছে।

শেখর—অনসূয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তোমার কোন লাভ আছে কি ?

অবন্তী—হ্যাঁ। তাহলে নিখিলের ভুল ভেঙ্গে যাবে।

সব রহস্য এইবার একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়। শেখর বলে—বুঝলাম, নিখিল মজুমদারই তাহলে অনসূয়াকে বিয়ে করবার জন্য তৈরী হয়েছে।

অবন্তী—হ্যাঁ। আমাকে এত চিনতে পেরেও সে মানুষ এত ভুল করলো কেমন করে ? আশ্চর্য, যদি জানতাম যে অনসূয়া ওকে ভালবেসেছে, তবে না হয়…।

শেখর—তবে কি ?

অবন্তী—তবে আমি চুপ করেই সরে যেতাম, আর আপনাকেও এই অনুরোধ করতাম না।

হেসে ফেলে শেখর—তুমি স্পষ্ট করে একটি সত্য কথা বলবে ?

অবন্তী—বলবো, অন্তত আপনার কাছে কিছুই লুকবো না।

শেখর—তুমি কাকে জব্দ করতে চাও ? নিখিলবাবুকে, না অনসূয়াকে, না আমাকে ?

অবন্তীর মুখটা করুণ হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে—আমি

কাউকেই জব্দ করতে চাই না। আমি চাই সকলেই সুখী হোক।
শেখর—ভাল কথা। কিন্তু আমাকে ঐ অনুরোধ আর করো না।
বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে অবন্তী, এবং অবন্তীর চোখের সেই বিস্ময়ও যেন মৃদু ভয়ে সিরসির করে। অবন্তী বলে—কেন ?
যেন প্রচণ্ড একটা ধিক্কার কোন মতে বিস্ফোরণের আবেগ থামিয়ে শেখর মিত্রের কথাগুলির মধ্যে উত্তাপ ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে—তুমি আমার কে ? আমিই বা তোমার কে ? আমার কাছে এত বড় দাবি করবার সাহস কোথায় পেলে অবন্তী ? এত নির্লজ্জতাই বা কোথায় পেলে ?
অবন্তী—শেখরবাবু!
শেখর—কি ?
অবন্তী—আমি জানি।
শেখর—কি জান ?
অবন্তী—আপনি মনে-প্রাণে চান যে আমি সুখী হই।
শেখরের চোখ দপ ক'রে জ্বলে ওঠে—কেন চাই ?
অবন্তী—তা'ও জানি। আপনি আমাকে ভালবাসেন।
হঠাৎ একটি আচমকা আঘাতে শেখরের সব মুখরতা বোবা হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবন্তীর কালো চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তি আরও শানিত হয়ে চিকচিক করছে। সব জানে, সব বুঝে ফেলেছে অবন্তী। অবন্তী সরকারের জন্য শেখর মিত্রের মনের গভীরে আজও যে অনুভবের মায়া মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে, তাকে যেন অনেকদিন আগেই দেখে ফেলেছে অবন্তী। তাই বার বার ডাকে, তাই তো শেখর মিত্রকে যত অদ্ভুত অনুরোধ করতে একটুও লজ্জা পায় না অবন্তী। কিন্তু…। কিন্তু কি ? কি ভয়ানক একটা কৌতূহল শেখর মিত্রের বুকের ভিতর উতলা হয়ে উঠছে! কিন্তু কিসের জন্য, কেন, শেখর মিত্রের জন্য অবন্তী সরকারের মনে এক বিন্দু মোহ আজও ফুটে উঠলো না ? সত্যিই কি তাই ? অবন্তী সরকার তার কোন স্বপ্নের মধ্যে ভুলেও

শেখর মিত্রের হাতে হাত রাখবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠেনি? শুধু শেখর মিত্রের জীবন নিংড়ে কতকগুলি উপকার লুঠ ক'রে নিতেই ভাল লাগে অবন্তীর?

অদ্ভুত এক দুর্বলতায় অলস হয়ে যায় শেখর মিত্রের নিঃশ্বাসগুলি। অবন্তী সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, তুমি ভালবেসেছ কি?

কিন্তু বৃথা এই প্রশ্ন। শেখর জানে, এই প্রশ্ন একটা কপট ঠাট্টার চেয়েও অসার। অবন্তী সরকার যে তার জীবনের উপকারক শেখর মিত্র নামে একটা লোককে ভালবাসে না, এই ক'মাসের ইতিহাসে, অবন্তী সরকারের জীবনের এই রঙীন উন্নতির ইতিহাসে সেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

শেখর মিত্রকে ভালবাসতে কেন ইচ্ছে হলো না অবন্তীর, কেন ভালবাসতেও পারলো না? এই তো একটিমাত্র প্রশ্ন, যার জন্য শেখর মিত্রের জীবনের অনেক মুহূর্তের ভাবনা বিস্মিত হয়েছে, এবং সেই বিস্ময় একটা তীক্ষ্ণ অপমানের কৌতুকে ব্যথিতও হয়েছে।

অবন্তীর সুন্দর মুখের ছবিটা যেন শেখরের দু'চোখ জুড়ে ভাসছে। বড় সুন্দর মুখ, অবন্তীকে এমন সুন্দর কোনদিনও দেখায়নি। ঐ অবন্তী জানে, শেখর মিত্র তাকে ভালবাসে। অবন্তী নিজের মুখে ঘোষণা ক'রে শেখরের বুকের নিভৃতে গোপন করা একটি অনুভবের মায়াকে আজ যেন উৎসবের পতাকার মত বাতাসে মেলে দিয়েছে। এই যথেষ্ট। অবন্তীর মনের কাছে কৈফিয়ত দাবি করবার কোন অর্থ হয় না। শেখর মিত্রকে না ভালবাসবার অধিকার অবন্তীর খুব আছে।

আচ্ছা, এবার আমি চলি। চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় শেখর।

অবন্তী বলে—তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

শেখর– তার মানে?

অবন্তী—আপনি অনসূয়াকে···।

শেখর—আমি ইচ্ছে করলেই অনসূয়াও আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করবে কেন ?

অবন্তী—নিশ্চয় করবে ? সে বিশ্বাস আমার আছে। আপনি একবার বলেই দেখুন না কেন ; তখন বুঝবেন যে আমার বিশ্বাস মিথ্যে নয়।

শেখর—তুমি এই বিশ্বাস কোথায় পেলে ?

কোন উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অবন্তী। শেখরের হু'চোখের কোণে এতক্ষণের স্নিগ্ধতার ছায়া হঠাৎ আবার বিরক্ত হয়ে কঠোর হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে শেখর। অবন্তী সরকারের কালো চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তি একেবারে নিভে গিয়েছে। অবন্তীর চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। একটা অসহায় শিশুর মুখ, আদর দাবি করে শুধু দাবির জোরে, যুক্তির জোরে নয়। যেন নিজের ভুলের আর অপরাধের ভয়ে দিশাহারা একটা আত্মার কান্নাভরা মুখচ্ছবি।

শেখর—এ কি করছো অবন্তী ?

অবন্তী—নিখিলকে জব্দ করবার জন্যে নয়, আপনাকে সুখী করবার জন্যেই এই অনুরোধ করেছি শেখরবাবু। বিশ্বাস করুন। অনসূয়াকে আমি চিনি। অনসূয়ার মত মেয়ে আপনার মত মানুষকেই ভালবাসতে চায়, ভালবাসতে পারবেও। আর আপনিও অনসূয়ার মত মেয়েকে জীবনে পেলে সুখী হবেন।

চুপ করে অবন্তী। শেখরও কোন প্রশ্ন করে না। সারা ঘরের নীরবতা যেন বেদনায় কোমল হয়ে অবন্তীর চোখের জলের ফোঁটা-গুলিকে বরণ করছে। একেবারে স্বচ্ছ মুক্তার মত, একেবারে খাঁটি চোখের জল। কোন ভেজাল নেই।

অবন্তী বলে—বিশ্বাস করুন। আপনি সুখী হবেন বলেই আমার এই অনুরোধ।

শেখর—সেকথা থাক। বল, তুমি সুখী হবে ?

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—আচ্ছা।

চলে গেল শেখর।

উনিশ

দরজা বন্ধ ক'রে সোফার কোণ ঘেঁষে ক্লান্ত পাখির মত যেন সুন্দর চেহারা আর সুন্দর সাজের সব শোভা গুটিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে অবন্তী সরকার।

যা মনে মনে ভেবে রেখেছিল অবন্তী, তাই করতে পেরেছে। কোন ভুল হয়নি। জীবনে প্রতিজ্ঞা অটুট রাখতে হলে সংসারের সত্য ও মিথ্যার কাছে যে কঠোর অভিনয় করতে হয়, সেই অভিনয়ই নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে অবন্তী। নিজের স্বার্থ, নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে হলে, হাসি-কান্নার মধ্যে একটু নকল মায়া রাখতে হয়। ভালবাসার জন্য, অবন্তী ও নিখিল নামে দুটি মানুষের ভালর জন্য এই অভিনয় করতে হলো। অবন্তীর চোখের জলকে একটুও সন্দেহ করতে পারেনি শেখর মিত্র।

অবন্তী সরকারের জীবনের ভালবাসার পথে কাঁটা হয়েছে অনসূয়া। সেই কাঁটা সরাতে হবে। খুব সুন্দর ক'রে সেই কাঁটা সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করতে হবে। ক'রে ফেলেছে অবন্তী। শেখর মিত্র অবন্তীর অনুরোধের মায়া আজও এড়াতে পারেনি। রাজি হয়ে চলে গিয়েছে।

তারপর? তারপর নিখিল মজুমদার আবার এই ঘরের দরজার কাছে এসে দেখা দিতে আর কতই বা দেরি করবে? ফিরে আসবে নিখিল, অনসূয়ার গানের সুর সব সুধা হারিয়ে নিখিল মজুমদারের কানে বিষের জ্বালা ধরিয়ে দেবে।

শেখর মিত্রকে বিয়ে করতে অনসূয়া রাজি হবেই হবে, কোন ভুল নেই। জানে অবন্তী, নিজের কানেই অনসূয়ার কাছে কতবার শুনেছে অবন্তী, প্রভা বউদির দাদার মত মহৎ মনের মানুষ পৃথিবীতে আর ক'জন আছে জানি না। শেখর মিত্রকে বড় বেশি শ্রদ্ধা করে অনসূয়া।

অবন্তীর মনের কল্পনাগুলিই তন্দ্রার মত আলস্যে শিথিল হয়ে যায়। যেন দেখতে পাচ্ছে অবন্তী, নিখিল মজুমদার আবার তার চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই নিখিল, যাকে নিজের চেষ্টায় ভাল চাকরিতে ভাগ্যবান ক'রে দিয়ে অবন্তী সরকার তাকে জীবনের ঘরে চিরকালের অতিথি করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এসেছে সেই নিখিল। তার চোখে করুণতা, মুখে অভিমান, মনে আত্মগ্লানি। অনসূয়ার কাছে যাবার পথ রুদ্ধ দেখে আবার এই পথে ফিরে এসেছে।

ছিঃ। নিজের অজ্ঞাতে, এবং বোধ হয় এরকম একটা ঘৃণার জ্বালাকে সামলাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল না অবন্তী, তাই বেশ জোরে একটা ধিক্কারের সুরে কথাটা বলেই ফেলে, এবং সোফার কোণ থেকে অলস দেহটাকে ধড়ফড়িয়ে সরিয়ে নেয় অবন্তী। তন্দ্রাটা যেন চোখের মধ্যে ছটফট করছে।

এই নিখিলকে কাছে ফিরে পাওয়ার জন্য, জীবনের প্রথম ভালবাসার সম্মান রক্ষার জন্য, নিজে সুখী হবার জন্য আজ একটা কঠোর অভিনয় নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে অবন্তী। অবন্তী সরকারের বুকের ভিতর একটা বিদ্রূপের অসার হাসি ছুটে বেড়ায়। হাসিটা হাহাকারের মত। কি ভয়ানক মিথ্যা কথা। শেখর মিত্র সুখী হবেই বলে নাকি অবন্তী সরকার চায় যে, অনসূয়ার সঙ্গে শেখর মিত্রের বিয়ে হোক। অবন্তী আজ খাঁটি চোখের জল ঝরিয়ে শেখর মিত্রকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে, অবন্তী সরকার শেখর মিত্রের জীবনের সুখের জন্যই চিন্তা করছে। বিশ্বাস করেছে, ধন্য হয়েছে মানুষটা। একটা অভিনয়ের কথা। কিন্তু কথাগুলি বড় সুন্দর, বড় মিষ্টি। বিশ্বাস না করেই বা পারবে কেন? ঐ মিথ্যা কথাগুলি বলতে গিয়ে অবন্তী সরকারের বুকের ভিতরটাও যেন মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। অবন্তী সরকারের ভাবনাগুলি আবার একটা অলস তন্দ্রার ভারে যেন অভিভূত হয়ে যায়।

মিথ্যে বলেনি অনসূয়া। শেখর মিত্র মানুষটা সত্যিই মহৎ মনের

মানুষ। বোকা হলেও কি মহৎ ঐ বোকামি! যে মেয়েকে মনে মনে ভালবাসে, তারই কাছ থেকে যত আঘাত উপহারের মত বরণ ক'রে নিয়ে খুশি হয়। অদ্ভুত মানুষই বটে। এমন মানুষের ভালবাসাকে ভয়ও করে। শেখর মিত্রকে ভালবাসতে হলে ওর কাছে যে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারা যাবে না। ওর ভালবাসাকে মস্ত একটা দয়া বলে মনে হবে। তা না হলে…।

ঘরের ভিতর ঢোকেন নিবারণবাবু। —কি রে, তুই এতক্ষণ এখানে চুপ ক'রে বসে কি ভাবছিস?

অবন্তীর ভাবনার ডোর নিবারণবাবুর কথার শব্দে হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যায়। বুঝতে পারে অবন্তী, সত্যিই অনেকক্ষণ ধরে এখানে চুপ ক'রে যেন চোরের মত বসে মিছামিছি অনেক ভাবনা ভুগছে, যদিও অবন্তীর প্রতিজ্ঞাটা বেশ সফল হয়েছে। আর এত ভাবনার কি-ই বা দরকার ছিল?

শরীর ভাল তো?

নিবারণবাবুর প্রশ্নে হেসে ফেলে উত্তর দেয় অবন্তী —হ্যাঁ ভাল।

নিবারণবাবু চলে যেতেই বুঝতে পারে অবন্তী, একটু মিথ্যে কথাই বলা হলো। মাথার ভিতরে কেমন একটা ভার থমকে রয়েছে। শরীরটাকেও কোনদিন এত দুর্বল মনে হয়নি। আজকের অভিনয় বেশ নিষ্ঠুর একটা শাস্তিও দিয়েছে, নইলে এই শরীরের ভিতরেও এত যন্ত্রণা এমন ক'রে অস্থির হয়ে ওঠে কেন?

অনসূয়ার ভাগ্যটা মন্দ নয়। পরের ভালবাসার [illegible] [illegible] গানের টানে কাছে ছুটে গিয়ে ওকে আপন ক'রে নিতে চায়। আবার অন্যের ভালবাসা না পেয়ে ফিরে যাওয়া মানুষ অনসূয়াকে বিয়ে করতে অনায়াসে রাজি হয়ে যায়। বাঃ। আরও ভাগ্য ভাল অনসূয়ার, এত এলোমেলো ইতিহাসের কোন খবর রাখে না অনসূয়া। সাদা মনের অভ্যর্থনা নিয়ে জীবনের সঙ্গী বরণ করবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। অনসূয়ার মনের মতন একটা মন থাকলেই তো ভাল হতো।

অবন্তী সরকারের চোখের সুন্দর উৎসবের মত একটা স্বপ্নের আবছায়া যেন আনাগোনা করে। আজ না হোক কাল, কাল না হোক আরও কয়েকটি দিনের মধ্যেই শেখর মিত্রের একটা ইচ্ছার বাণী অনসূয়ার কানের কাছে গিয়ে গানের মত বেজে উঠবে। একটি মহৎ মনের মানুষ, সেরকম মানুষ পৃথিবীতে আর ক'জন আছে জানে না অনসূয়া, সে-ই অনসূয়াকে হাত ধরে তার চিরকালের ভালবাসার ঘরে ডেকে নিয়ে যেতে চায়। শেখর মিত্র বড় সাহসী। বড় লোভী। ছিঃ।

দুহাতে কপাল টিপে ধরে অবন্তী সরকার। আজকের অভিনয়ের আনন্দটা বুকের ভিতর আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে বন্ধ দরজার দিকে তাকায় অবন্তী। না, কেউ নেই, অনেকক্ষণ হলো চলে গিয়েছে শেখর।

ছি ছি ছি! কত সহজে হ্যাঁ বলে চলে গেল লোকটা। বলতে মুখের ভাষাটা একটুও বাধলো না। অবন্তী সরকারের চোখের একটা ইশারায় লোকটা বোধ হয় চুরি-ডাকাতি আর মানুষ-খুন করতে পারে। নিখিল মজুমদার যে-মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে, তাকে শুধু নিজের মহত্ত্বের জোরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভালবাসলে যে ডাকাতি করা হয়, একটা মানুষের আশাকে খুন করা হয়, এই সামান্য সত্যটুকু বুঝবার মত কোন সন্দেহও কি নেই শেখর মিত্র নামে ঐ বিদ্বানের মনে?

জানালা খুলে পথের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে থাকে অবন্তী। শেষ ট্রাম পার্ক সার্কাসের ডিপোর দিকে ফিরছে। অনেক রাত হয়েছে। কে জানে কোথায়, এই পৃথিবীর কেমন একটা ঘরে এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে আর স্বপ্ন দেখছে শেখর মিত্র?

কুড়ি

আসুন বৈজ্ঞানিক। শেখরকে দেখতে পেয়েই সম্ভাষণ জানায় অনসূয়া। এবং কথাটা বলতে গিয়ে হেসেও ফেলে।

এই হাসির মধ্যে একটা ঠাট্টার সুর বেজে উঠলেও, হাসিটা যে নিছক ঠাট্টা নয়, সেটা হাসির স্বরেই প্রমাণিত হয়। বেশ মিষ্টি স্বর। প্রীতি আছে, শুভেচ্ছা আছে, অনসূয়ার হাসির সেই মিষ্টি স্বরে। অনসূয়ার শ্রদ্ধার একটা দুর্ভাবনাই যেন এতদিনে নিশ্চিন্ত হয়েছে। শেখর মিত্রের মন জুড়ে অবন্তী নামে এক নারীর ভালবাসার স্মৃতি আব অনুভব ছড়িয়ে আছে। শেখর মিত্রের মনটা একলা নয় : সেই মনের সঙ্গে একটা স্বপ্ন আছে। ভদ্রলোকের জীবনটাও আর একলা পড়ে থাকবে না। জীবনের সঙ্গিনীকে চিনে রেখেছে শেখর মিত্র। খুবই ভাল সঙ্গিনী। যেমন সুন্দর, তেমনই শিক্ষিত আর তেমনই রোজগেরে। শেখরের মত মানুষের সঙ্গে অবন্তীর মত মেয়েকেই মানায়।

শেখর বলে—কালই তোমার চিঠি পেয়েছি, তবু কাল আসতে পারিনি ; একটু দেরি হয়ে গেল।

শেখরের গম্ভীর মুখের গম্ভীর স্বর শুনে যদিও একটু বিস্ময় বোধ করে অনসূয়া, তবুও আর একবার উচ্ছ্বসিত স্বরে হেসে ওঠে—একটু দেরি হয়েছে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি।

শেখর—ঠিকই বলেছ অনসূয়া ; তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র যদি ব্যস্ত হয়ে চলে আসতাম তবে ভয়ানক ভুল হতো। একদিন দেরি করে ভালই হলো।

অনসূয়া—তার মানে ?

শেখর—তার মানে, যদি কালই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম, তবে একটা ভুল কথা বলে দিয়ে চলে যেতাম, আর তুমি আমার সেই ভুল কথাটাকেই বিশ্বাস ক'রে ফেলতে।

অনসূয়ার মুখ এইবার গম্ভীর হয়—কিছুই বুঝলাম না শেখরবাবু।

অনসূয়ার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে শেখর। শেখরের চোখের এরকম অদ্ভুত দৃষ্টি কোনদিন দেখেনি অনসূয়া। যেন অনসূয়াকে এই প্রথম দেখছে শেখর, এবং এই প্রথম দেখার অনুভবেই অনসূয়ার প্রাণমনের পরিচয় বুঝে ফেলবার চেষ্টা করছে। অনসূয়া আর একবার হাসতে চেষ্টা করে, এবং সেই হাসির মধ্যে একটা চতুর ঠাট্টার মধুরতা মিশিয়ে দেয়।—কিন্তু এত গম্ভীর হবার কি হলো? আমার মুখের দিকে এত কষ্ট করে তাকিয়ে না থেকে যার মুখের দিকে তাকালে কাজ হবে······।

শেখর—ভুল।

চমকে ওঠে অনসূয়া—কিসের ভুল? কার ভুল?

শেখর—তোমার ভুল। তুমি না বুঝে-সুঝে ঠাট্টা করছো অনসূয়া।

অনসূয়ার চোখের দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়। শেখর মিত্রকেই যেন নতুন ক'রে দেখতে হচ্ছে, এবং শেখর মিত্রও নতুন হয়ে গিয়েছে মনে হয়। এ তো সেই হাসি-ঠাট্টার শেখরবাবু নয়, ভয়ানক গম্ভীর অভিমানের শেখর মিত্র।

অনসূয়া বলে—আমি ঠাট্টা করতে চাই না। কিন্তু আমাকে বুঝিযে দিন যে, কোথায় কিসের ভুল হলো।

অনসূয়ার প্রশ্ন শুনেও যেন শুনতে পায়নি শেখর। এবং শেখরের মনটাও যেন নিজেরই চক্রান্তের একটা অদ্ভুত মধুরতার জালে জড়িয়ে পড়েছে। চোখ দুটো যেন ইচ্ছে করে একটা মুগ্ধতা খুঁজছে। অনসূয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়ে উঠুক চোখ, মিষ্টি হয়ে যাক বুক। অনসূয়া পৃথিবীর কোন মেয়ের চেয়ে ছোট নয়, কারও চেয়ে কম সুন্দর নয়। অনসূয়া যার জীবনের সঙ্গিনী হবে, তার জীবন সুখী হবেই হবে। এই মেয়েকে জীবনে ভাল লাগিয়ে নেবার জন্য চেষ্টা করতে হয় না, এমন মেয়ে আপনা থেকেই ভাল লেগে যায়।

শেখর—আমি ভুল করেছি ঠিকই, আগে ভুল করেছি। তার মধ্যে একটা বড় ভুল এই যে, তোমাকে দেখেও বুঝতে পারিনি।

অনসূয়া আবার হেসে হেসে একটা ঠাট্টার আবেশ ছড়িয়ে দিয়ে শেখর মিত্রের এই ভয়ানক গম্ভীর কথার কঠোর শব্দগুলিকে লঘু ক'রে দিতে চেষ্টা করে।—আমাকে দেখা মাত্র নয়নবাবুদের কাকাতুয়াটাও বুঝে ফেলতে পারে যে, আমার কোন মতলব নেই···।

একটু থেমে নিয়েই খিলখিল করে হেসে ওঠে অনসূয়া—নয়নবাবুদের কাকাতুয়াটা ভয়ানক সাবধান। মানুষ কাছে এসে দাঁড়ালেই বুঝে ফেলে যে ওর ঝুঁটিতে হাত দেবার একটা মতলব নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনি ঠুকরে দেয়। কিন্তু আমাকে ঠোকরায়নি, কারণ আমার কোন মতলব ছিল না।

হেসে হেসে গল্প বলছে অনসূয়া, কিন্তু শেখর মিত্রের বুকের ভিতরে একটা অপরাধ যেন নিষ্ঠুর ভীরুতায় দপদপ করতে থাকে। মতলব? অনসূয়ার কোন মতলব নেই, কোনদিনও ছিল না। এবং অনসূয়ার কাছে কোনদিন কোন মতলব নিয়ে আসেনি শেখরও। কিন্তু আজ? আজ শেখর মিত্র যে একটা মূর্তিমান মতলব?···না, ঠিক তা নয়। একটা মতলবের দূত, একটা অভিসন্ধির প্রতিনিধি; এবং সে অভিসন্ধি আবার নিজের জীবনের অভিসন্ধি নয়। অবন্তী সরকারের জীবনের স্বপ্নকে নিষ্কণ্টক করবার জন্য নিজে আজ কণ্টক বরণ করতে এসেছে শেখর।

না, কণ্টক নয়। অনসূয়াকে কণ্টক বলবার কোন অধিকার নেই। নিজেরই মনের ভাষার ভয়ানক ভুল শুধরে নিয়ে আবার কল্পনা করতে পারে শেখর। সে নিজেই আজ অনসূয়ার জীবনের কণ্টক হবার জন্য একটি গম্ভীর অভিমানের ছলনা নিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অনসূয়াকে অন্তত আভাসে এইটুকু আজ এখনি জানিয়ে যেতে হবে যে, আমি তোমারই অপেক্ষায় রয়েছি।

হঠাৎ শেখর মিত্রের চোখ দুটো যন্ত্রণা-কাতর রোগীর চোখের মত করুণ হয়ে ছটফট করে ওঠে। শেখর বলে—তুমি কি সত্যিই তোমার ভুল বুঝতে পারনি অনসূয়া?

অনসূয়া—না।

শেখর—আমার কাছে চিঠিতে কি লিখেছ, ভুলে গেলে ?
অনসূয়া—না ভুলিনি। একটা দিন দেরি ক'রে চিঠি লিখলে আপনাকে ওরকম অনুরোধ করতাম না।
আশ্চর্য হয় শেখর—তার মানে ?
অনসূয়া—আমি বিয়ে করবো, তাতে আপনার আপত্তি আছে কিনা, একথা জিজ্ঞেসা করবার কোন দরকার ছিল না।
চেঁচিয়ে ওঠে শেখর—দরকার ছিল। দরকার এখনও আছে।
ভয়াতুর চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে অনসূয়া। আস্তে আস্তে কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করে—সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না শেখরবাবু।
শেখর—আমার আপত্তি আছে।
একি বলছেন আপনি ? প্রশ্ন করেই স্তব্ধ দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে অনসূয়া।
ধীরে ধীরে হেঁটে ঘর ছেড়ে চলে যায় শেখর।
প্রভা চেঁচিয়ে ডাক দেয়—দাদা চলে গেল নাকি অনসূয়া ?
অনসূয়া—হ্যাঁ।

একুশ

অনাদিবাবু বলেন—একচল্লিশ টাকা তো ব্যাঙ্কের রাগ থামাবার জন্য সুদ দিতেই চলে গেল।
অনাদিবাবুর কণ্ঠস্বরের রকম দেখেই বুঝতে পারে শেখর, অনাদিবাবুর পিঠের বেদনাটা এইবার বোধ হয় একেবারে বুকের ভিতরে চলে এসেছে। টালিগঞ্জের গলির ক্ষুদ্র বাসাবাড়ির বুকে আবার আর্তনাদ শুরু হয়েছে। উঠানের রজনীগন্ধাকে একটা ঠাট্টা বলে মনে হয়। রতনবাবুর ছেলেকে পড়াবার কাজ ছাড়া টাকা আনবার মত অন্য কোন কাজ করবার সৌভাগ্য এখনও হয়নি।
কাজের জন্য দরখাস্ত করাই একটা কাজ হয়ে উঠেছে। এবং আর একটি কাজ খুঁজছে শেখর। কিন্তু এই খোঁজাখুঁজির পরিণামও মাঝে

মাঝে যেন এক একটা নির্মম বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে অনিশ্চিত হয়ে যায়। ছাত্রের অভিভাবক বলেন—আপনার যদি কোন ভাল স্টেটাস থাকতো, তবে ভাল মাইনে দিতে···অর্থাৎ আপনার পক্ষে এক'শো টাকা মাইনে দাবি করবার একটা অর্থ হতো।

স্টেটাস চাই। অদৃষ্টের নিয়মটাকে বুঝতে চেষ্টা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে হেসে ফেলে শেখর। স্টেটাস নেই বলে টাকা আসছে না; না টাকা নেই বলে স্টেটাস হচ্ছে না? ঐ যে বন্ধু নগেন, যাকে পুরো দুটো মাস ধরে টিগনোমেট্রির মারপ্যাঁচ বুঝিয়ে দিয়ে একটু উপকার করতে পেরেছিল শেখর, সেই নগেন এখন সরকারী কলেজের অধ্যাপক। টায়েটুয়ে পাস নম্বর পেয়েও নগেন যে কেমন ক'রে ওরকম ভাল মাইনের একটা অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেল, সে রহস্য না জানলেও অনুমান করতে পারে শেখর। নগেনও প্রাইভেটে ছাত্র পড়ায়, এবং ছাত্রের বাপ খুশি হয়ে নগেনকে দুশো টাকা মাইনে দেয়। শেখর জানে, নগেন তাতে সন্তুষ্ট নয়। শেখরের কাছে অনেকবার রাগ ক'রে আক্ষেপ ক'রেছে নগেন—ছেড়ে দেব; দুশো টাকায় প্রাইভেট ছাত্র পড়ানো পোষায় না। যেখানে ট্যালেন্টের সম্মান নেই, সেখানে যাওয়াই উচিত নয়।

অনাদিবাবুর গম্ভীর গলায় আর্তনাদ আবার কর্কশ স্বরে বেজে ওঠে। —তাহলে কথা রইল বিভা, মধু বিধুর গরম জামা এই শীতে আর হবে না।

বিভাময়ী—না হলে যে ছেলে দুটো এই শীতে নিউমোনিয়াতে··।

চেঁচিয়ে ওঠেন অনাদিবাবু—ওসব মেয়েলি ন্যাকামি দিয়ে যদি আমাকে বিরক্ত কর, তবে মনে রেখ, আমার এই গরম আলোয়ান-টাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'রে পুড়িয়ে দেব।

ঘরের ভিতরে বসে চুপ ক'রে এই ধিক্কারের আঘাতগুলিকে শুধু সহ্য করে শেখর; কিন্তু মনে মনে যেন নিজেকেও ধিক্কার দিয়ে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে থাকে। টালিগঞ্জের গলির একটা ক্ষুদ্র বাসাবাড়ির এই কয়েকটা মানুষের জীবনের এই ক্লেশ শেখর

মিত্রেরই চোখের একটা কুৎসিত ভুলের সৃষ্টি। একটা মেয়ের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হওয়ার ভুল। লম্পট ধনী বাজে মেয়েমানুষের খপ্পরে পড়ে লাখ টাকা ফুঁকে দিয়ে আর ফতুর হয়ে ভিখিরী হয়ে যায়; শেখরের জীবনের অনাচারও প্রায় সেইরকম। অথচ শেখর মিত্র ওরকম লম্পট ধনীর চেয়েও বেশি মূর্খ। তবু সে লম্পট কিছু পেয়ে, কোন বস্তুর বিনিময়ে দাম দিতে গিয়ে ফতুর হয়। কিন্তু শেখর মিত্রের প্রাপ্তি যে একেবারে শূন্য। কোন কিছু নয়, কোন কিছুর বিনিময়ে নয়, শুধু ঠকবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেকে দরিদ্র করেছে শেখর।

দেখতে পেয়েছে শেখর, এই কয়েকদিন ধরে দেখে আসছে, রোজই একবার ক'রে পঞ্জিকা ঘাঁটেন বিভাময়ী। উপোস করবার জন্য যেন একটা ছুতো খুঁজছেন বিভাময়ী। যত পবিত্র দিনক্ষণ আছে, সবগুলিকেই কখনও একবেলা এবং কখনও বা দুবেলা উপোস দিয়ে পুজো করছেন। কি আশ্চর্য, পবিত্র দিনগুলি কত ঘন-ঘন দেখা দেয়, এবং এক একদিন প্রায় জ্ঞান হারিয়ে আধমরার মত মাদুরের উপর পড়ে থাকেন বিভাময়ী।

অনাদিবাবু আবার আক্ষেপ করেন, এবং আক্ষেপটাই যেন চাপা কান্নার স্বরের মত গুনগুন করে।—কি ভেবেছিলাম, আর কি হলো! ভেবেছিলাম মধু আর বিধুকে এবছর একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেব। ভাল স্কুল দূরে থাক, ঐ চালাঘরের স্কুলও আর ওদের কপালে নেই। এবার নাম কাটিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখতে হবে। দরজার কপাটে কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে শেখর মিত্রের বিমর্ষ মনের ভয় চমকে ওঠে। কে এসেছে? বাড়িওলার দারোয়ান? ব্যাঙ্কের পিয়ন? রাধানাথ মুদি?

কিংবা হয়তো রতনবাবুর ছেলেটাই এসেছে, এইবার জানিয়ে যেতে যে, বাবা বলেছেন, আপনাকে আর পড়াতে হবে না, প্রফেসার নগেনবাবু এবার থেকে আমাকে পড়াবেন।

দরজা খুলে দিতেই এক অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে

বিস্মিত হয় শেখর। এবং ভদ্রলোক এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে। —আপনিই কি শেখরবাবু?

হ্যাঁ।

আমি আপনার কাছেই এসেছি।

বলুন, কেন?

আপনাকে দেখতে?

সত্যিই ভদ্রলোক একেবারে অপলক চোখ নিয়ে শেখর মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন দেখে ধন্য হয়ে যাচ্ছেন।

শেখর একটু বিরক্তভাবে বলে—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে···।

ভদ্রলোকও হেসে ফেলেন—আপনার মনে হচ্ছে, একটা পাগল এসে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে।

শেখর—না, মনে হচ্ছে, আপনার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে।

ভদ্রলোক— তা তো আছেই।

শেখর—বলুন, কি উদ্দেশ্য?

ভদ্রলোক—আমাকে ক্ষমা করুন।

শেখর ভ্রূকুটি করে—তার মানে?

ভদ্রলোক—তার মানে, আমি নিখিল মজুমদার।

চমকে ওঠে শেখর মিত্র। এবং নিখিল মিত্রের ঐ প্রসন্ন ও কৃতজ্ঞ মুখেরই অদ্ভুত একটা ক্ষমাপিপাসু বেদনার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। ক্ষমা কেন? কিসের ক্ষমা?

নিখিল বলে—ক্ষমা তো করবেনই, তা ছাড়া আপনার ব্লেসিং চাই।

শেখর জোর ক'রে হাসতে চেষ্টা করে—আমার বয়স বোধ হয় আপনার চেয়ে······।

নিখিল—আমার চেয়ে বোধহয় একটু কমই হবে। তাতে কি আসে যায় শেখরবাবু? আপনি যে আমার চেয়ে অনেক অনেক বড়।

শেখর—ওসব কথা আপনি চেঁচিয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করবো না।

নিখিল—না করুন, তাতে আমার বিশ্বাসেরও কোন ক্ষতি হবে না।

শেখর—যাক্ সেসব কথা।

নিখিল—আমিও বলি, যাক্ সেসব কথা। আসল কথা এই যে, আমার স্বার্থপর মনটাকে ক্ষমা করুন।

শেখর—স্বার্থপর মন ?

নিখিল—হ্যাঁ। আপনি নিজেকে বঞ্চিত ক'রে আমাকে চাকরি দিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য আপনারই কাছে ঋণী।

শেখর—এই কথাটি আপনি বলবেন, এতক্ষণ এই ভয়ই করছিলাম।

নিখিল—না বলে উপায় নেই শেখরবাবু। আমি জীবনে সুখী হয়েছি, একথা মনে করলেই যে আপনার কথা মনে পড়ে।

শেখর হাসে—কিন্তু সুখী হবার একটা ব্যাপার যে এখনও বাকি আছে ?

নিখিল—কি বললেন ?

শেখর—বিয়েটা।

নিখিল—হ্যাঁ বাকি আছে বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়েছি।

শেখর—কিরকম ?

নিখিল হাসে—আমাকে এখন আপনার কুটুম বলে একরকম ধরেই নিতে পারেন।

শেখর আশ্চর্য হয়—আমার কুটুম ? অবন্তী সরকারের সঙ্গে আমাদের তো কোন কুটুম্বিতার সম্পর্ক নেই।

নিখিলও আশ্চর্য হয়ে তাকায়—অবন্তী সরকারের সঙ্গে আপনাদের কুটুম্বিতা নাই বা থাকলো। অনসূয়ার সঙ্গে তো আছে।

অনসূয়া ? চেঁচিয়ে ওঠে শেখর।

নিখিল—হ্যাঁ।

শেখর—অনসূয়ার সঙ্গে আপনার বিয়ে ?

নিখিল—হ্যাঁ।

শেখর—অবন্তীর সঙ্গে নয় ?

নিখিল—ছিঃ, কি যে বলেন !

শেখর—কিন্তু অনসূয়া কি···।

শেখরের মুখের প্রশ্ন হঠাৎ যেন থমকে চুপ ক'রে যায়। নিখিল বলে —কি বললেন ?

শেখর—না, কিছু নয়।

নিখিল মজুমদারের প্রসন্ন মুখের দিকে অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে তাকায় শেখর। এবং সেই মুহূর্তে শেখরের সেই কুণ্ঠিত চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত একটা বেদনায় যেন বিচলিত হয়ে কাঁপতে থাকে। কী বিপুল আশ্বাসে খুশি হয়ে আছে নিখিল মজুমদার! হয়তো সত্যিই আগে রাজি হয়েছিল অনসূয়া, এবং অনসূয়ার সেই প্রতিশ্রুতির পুলক মনে-প্রাণে গ্রহণ ক'রে খুশি হয়ে রয়েছে নিখিল মজুমদারের জীবনের আশা। অনসূয়াকে ভালবাসে নিখিল; অনসূয়ার সঙ্গে জীবনের একটি সুন্দর নীড় বাঁধবার কল্পনা যেন নিখিলের চোখে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু জানে না নিখিল, ওর স্বপ্নকে এই শেখর মিত্রই একটা মিথ্যা হিংসার সাপের মত দংশন ক'রে এসেছে। একটা কপট আগ্রহের অভিনয় ক'রে অনসূয়ার মনে নতুন ভাবনা ধরিয়ে দিয়ে এসেছে শেখর। পৃথিবীর এক ভদ্রলোককে বিয়ে করবে অনসূয়া, এই সামান্য ও সরল একটা ঘটনা সহ্য করতে শেখর মিত্র রাজি নয়; আপত্তি আছে শেখরের, এই কথা শেখরের মুখ থেকেই শুনতে পেয়ে কি-ভয়ানক চমকে উঠেছিল অনসূয়া! মনে পড়ে শেখরের, অনসূয়ার সেই বিস্মিত ব্যথিত ও স্তব্ধ চোখ দুটোর করুণ দৃষ্টিটাও মনে পড়ে।

বুকের ভিতরও একটা যন্ত্রণার স্বর যেন ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে। —ছি ছি, কিসের জন্য, কার জন্য, বেচারা নিখিল মজুমদারের স্বপ্ন ব্যর্থ করবার চক্রান্ত করেছে শেখর ?

নিখিল—এবার তাহলে খুশি হয়ে আমাকে চলে যেতে বলুন শেখর-বাবু।

শেখর মিত্রের গম্ভীর ও বেদনাক্লিষ্ট চেহারাটা হঠাৎ যেন হেসে উচ্ছল হয়ে ওঠে—খুব খুশি; এর চেয়ে ভাল খুশির খবর আর কি হতে পারে ?

নিখিল চলে যেতেই বোধহয় এক মিনিটের বেশি দেরি করে না শেখর। মনে মনে নিজের মনের একটা ভুলের অভিশাপকে ধিক্কার দিয়ে কয়েকটি মুহূর্ত শুধু ছটফট করে। এই অতি নীচ হীন নিষ্ঠুর ও মূর্খ ভুলটাকে এই মুহূর্তে মিথ্যে ক'রে দিতে হবে।
নিজেরই বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের উপর ভয়ানক একটা সন্দেহ। মাথাটা বোধহয় সুস্থতা হারিয়েছে, নইলে অবন্তীর ঐ চক্রান্তের প্রস্তাবেও রাজি হয় মানুষ? সন্দেহ করে শেখর, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই উপর যে ঘৃণা মনের ভিতরে শিউরে ওঠে তেমন ঘৃণা আর কাউকে করবার দুর্ভাগ্য জীবনে কখনও হয়নি।
অবন্তী সরকারের অনুরোধের নিষ্ঠুরতাটা এতক্ষণে যেন শেখরের শান্ত মনের চিন্তায় ধরা পড়ে যায়। অবন্তীর ঐ অনুরোধের অর্থ, নিখিল নামে একটি মানুষের জীবনের স্বপ্নকে হত্যা করা, যে-মানুষ শেখরের জীবনের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা করেনি। অবন্তীর ঐ অনুরোধ রক্ষা করার অর্থ অনসূয়া নামে একটি মেয়েকে ফাঁকি দেওয়া আর অপমান করা। অনসূয়াকে ভালবেসে নয়, অনসূয়ার জীবনের কোন ভালবাসার দাবি পূর্ণ হবে বলে নয়, অনসূয়াকে বিয়ে করতে হবে এই উদ্দেশ্যে যে, অবন্তী নামে এক মেয়ের আকাঙ্ক্ষার পথ অবাধ হয়ে যাবে। কি ভয়ানক, কি ঘৃণ্য এই অনুরোধের হৃদয়টা! অথচ এমনই একটি অনুরোধের কাছে আত্মসমর্পণের সম্মতি ঘোষণা করে চক্রান্তের পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে শেখর।
এখনই বের হতে হবে। আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। ভবানীপুরের একটা বাসার কথা শেখরের মনে পড়ে। এখনই রওনা হলে পৌঁছে যেতে বড় জোর আধ ঘণ্টা।
অনসূয়া কি এখন বাড়িতে আছে? আছে নিশ্চয়। যদি না থাকে, তবে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না অনসূয়া বাড়ি ফিরে আসে। ঐ বোকা মেয়ের স্তব্ধ দুটো চোখের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিতে হবে।

বাইশ

নিখিল মজুমদারকে একটা চিঠি দিতে হবে, এবং সেই চিঠিতে শুধু আট-দশটা কথা লিখতে হবে। না নিখিলবাবু, আমি রাজি নই, ক্ষমা করুন, ইতি অনসূয়া।

হাতের কাছে কাগজ ও কলম ছিল। এবং লেখবার কথাগুলি মনের ভিতর ছটফটও করছিল। কিন্তু তবু হাত গুটিয়ে চুপ ক'রে বসে ভাবতে থাকে অনসূয়া, এ কি অদ্ভুত কথা বলে গেল শেখর মিত্র! আপত্তি আছে শেখর মিত্রের, কিন্তু কিসের আপত্তি?

চিঠি পেয়ে খুবই দুঃখিত হবে নিখিল মজুমদার; এবং অনসূয়ার মনের অদ্ভুত রকম দেখে অনসূয়াকে একটা বিশ্বাসঘাতিকা বলে সন্দেহ করবে আর রাগ করবে। করুক, উপায় নেই। অনসূয়াও রাগ করে নিখিলকে প্রশ্ন করতে পারে, তুমিও শেখর মিত্রের নামে যে-সব কথা বলে গেলে, সেসব কথা যে মিথ্যে নয়, তার কি কোন প্রমাণ আছে? কোথা থেকে, কেমন ক'রে আর কি দেখে প্রমাণ পেলে যে, অবন্তীকে ভালবাসে শেখর মিত্র?

ঘরের ভিতরে ঢুকে শেখর হেসে ওঠে—কোন ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত মনে চিঠি লেখ, আমি এখনি চলে যাচ্ছি।

অনসূয়া চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—বসুন।

শেখর—না, এখনই পেটের ভাবনায় বের হতে হবে।

অনসূয়া—কোথায় যাবেন?

শেখর—প্রথমে যাব ক্লাইভ স্ট্রীট, তারপরেই এলগিন রোডে ছাত্রের বাড়ি।

অনসূয়া—তা হ'লে চা খেয়ে যান।

—না। অনসূয়ার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার হেসে ওঠে শেখর—আজ কিন্তু তোমাকে একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

শুধু—আজ কেন? কোনকালেই ভাল দেখায়নি, তবু…।

শেখর হাসে—রাগ করো না, কথাটা বলতে একটু ভুল হয়েছে। আজ তোমার মুখে এই গম্ভীরতা একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

অনসূয়া —কেন?

শেখর—যখন ভাবসাব হয়ে গিয়েছে, সব ভয় ভেঙ্গে গিয়েছে, যখন বিয়ের দিনটার কথা ভেবে তৈরী হতে হচ্ছে, তখন···।

অনসূয়া—কে বললে?

শেখর—সবাই জানে! সবই শুনেছি।

অনসূয়া—কিন্তু···।

শেখর—কি?

অনসূয়া—আপনি খুশি হচ্ছেন কেন?

শেখর—তার মানে? আমি যে সব চেয়ে বেশি খুশি।

অনসূয়ার চোখে একটা অস্বস্তি যেন ভ্রূকুটি করে ওঠে।—কিন্তু আপনিই যে সেদিন বললেন, আপনার আপত্তি আছে।

হেসে ওঠে শেখর—বলেছিলাম বটে, অস্বীকার করছি না! কিন্তু তখন আপত্তি যে সত্যিই ছিল।

অনসূয়া—কেন?

শেখর—তখন কি জানতাম যে, নিখিল মজুমদারকে বিয়ে করবার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছো?

মাথা হেঁট করে অনসূয়া। কিন্তু অনসূয়ার গম্ভীর মখটা ধীরে ধীরে হেসে উঠতে থাকে। যেন একটা বৃথা ভাবনার, একটা ভুল কল্পনার বেদনা থেকে এতক্ষণে হঠাৎ মনটা মুক্ত হয়ে গেল। হাসছে শেখর মিত্র। সত্যিই, অনসূয়ার সঙ্গে হাসাহাসির সম্পর্ক ছাড়া শেখর মিত্রের মনে অনসূয়ার জন্য আর কোন সম্পর্কের ইচ্ছা নেই। শেখর মিত্রের কাছে অনসূয়া শুধু তার বোনের ননদ, এই মাত্র। মুখ তুলে তাকায় অনসূয়া, এবং এইবার অনসূয়ার মুখের হাসিতে চতুর এক আক্রমণের সঙ্কল্প ছটফট করতে থাকে। এবং প্রভা চা নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতেই চেঁচিয়ে ওঠে অনসূয়া—সায়েন্টিস্ট মশাই যে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার খুব ভাল বিজ্ঞান আয়ত্ত করে ফেলেছেন, সে

খবরও অনেকেই জানে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় শেখর—কটা বেজেছে, একবার ঘড়িটা দেখে বলে দে তো প্রভা।

হ্যাঁ, একটু ছুতো করে প্রভাকে ঘর থেকে সরিয়ে দিল শেখর মিত্র। এবং বেশ একটু বিব্রতভাবে, যেন মনের ভিতর একটা অপরাধের জ্বালা লুকিয়ে প্রশ্ন করে শেখর—অনেকেই জানে, একথার অর্থ কি অনসূয়া?

অনসূয়া—নিখিলবাবু জানে।

শেখর—কি জানে?

অনসূয়া—অবন্তীকে আপনি···।

শেখর—কথাটা খুব মিথ্যে নয়। কিন্তু নিখিলবাবু তোমাকে আর একটা বলতে ভুলে গিয়েছেন।

অনসূয়া—কি কথা?

শেখর—অবন্তী আমাকে ঘেন্না করে। কাজেই···।

চুপ করে শেখর। শেখরের চোখ দুটো উদাসভাবে হাসতে থাকে। তারপর ঘরের বাতাসকে যেন একটা মনখোলা ঠাট্টার আমোদে হাসিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে শেখর—এবার চলি। কাজেই বুঝতে পারছো অনসূয়া, ডুবে ডুবে জল খাওয়ার বিজ্ঞান আমি একটুও আয়ত্ত করতে পারিনি। শুধু ডুবে গিয়েছি।

তেইশ

দরজাটা খোলাই ছিল। সেই দরজার সামনে একটা ছায়া এগিয়ে আসতেই ঘরের ভিতর থেকে দু'পা এগিয়ে এসে উঁকি দেয় অনসূয়া। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে—একি? তুমি এই অসময়ে? হঠাৎ না বলে-কয়ে? কি মনে ক'রে অবন্তী?

অবন্তী—তুমিই বা এত চমকে উঠলে কেন অনসূয়া? কি মনে করে? এর আগে এর কম হঠাৎ না বলে-কয়ে অসময়ে কতবারই

তো এসেছি।

দুই বান্ধবী, অনসূয়া আর অবন্তী। জীবনে কোনদিন এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও দেখা যায়নি যে, অনসূয়া আর অবন্তী হঠাৎ দুজ'নে দুজনকে দেখতে পেয়ে এরকম শুকনো চোখ তুলে দুজনের দিকে দুজনে তাকিয়েছে। যে সাক্ষাতে হাসির উল্লাস ফোয়ারা হয়ে উছলে পড়তো. সে সাক্ষাৎ যেন একটা তীব্র অভিযোগের হানাহানি শিউরে তুলেছে।

অবন্তীকে হেসে হেসে অভ্যর্থনা করতে ভুলে গিয়েছে অনসূয়া। অনসূয়ার মনের ভিতরে সত্যিই যে ভয়ানক এক অভিযোগের আক্ষেপ বাজছে। নিজেকে কি মনে করে অবন্তী? শেখর মিত্রের মত মানুষের ভালবাসা পাওয়া যে ওর কত বড় সৌভাগ্য, সেটা বোধ হয় শুধু ওর ঐ ভাল চাকরির অহংকারে বুঝতে পারছে না অবন্তী? কি সাহস! শেখর মিত্রকে ঘৃণা করে অবন্তীর মত মেয়ে? অবন্তী সরকারের সেই সুন্দর ছায়া-ছায়া কালো চোখের তারায় একটা অভিযোগের বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে ফুটে উঠতে চায়। অনসূয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন সন্দেহ করছে, ভয় পাচ্ছে আর রাগ করছে অবন্তী। শেখর মিত্র নামে একটা লোক হঠাৎ এসে বিয়ে করবার ইচ্ছে জানালেই খুশি হয়ে রাজি হয়ে যেতে হবে, এরকম একটা বাজে মন নিয়েও কত অহংকারী হয়ে উঠেছে অনসূয়া। কত গম্ভীর হয়ে কথা বলছে! কোন মানুষের মনের আসল খবর না জেনে ওভাবে যে রাজি হতে নেই, এটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে কি অনসূয়ার? অনসূয়ার মুখ দেখে মনে হয়, এসেছিল শেখর মিত্র, এবং অনায়াসে শেখর মিত্রের কাছে জীবনের সব হাসি সঁপে দেবার ইচ্ছা জানিয়ে দিয়ে এখন এত গম্ভীর হয়ে উঠেছে অনসূয়া।

অবন্তী বলে—ইচ্ছে ক'রে তোমার কাছে অপমানিত হব জেনেও একবার আসতে হলো অনসূয়া।

অনসূয়া—এসেছ, ভালই করেছ, কিন্তু এরকম মিথ্যে সন্দেহ ক'রে

আমাকে অপমান না করলেই ভাল ছিল অবন্তী।

অবন্তী—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, সন্দেহ না করে পারছি না।

অনসূয়া—মিথ্যে সন্দেহ।

অবন্তী—মিথ্যে কেন? শেখরবাবু কি এখানে আসেননি?

অনসূয়া—এসেছেন বৈকি। আজও এসেছিলেন; এই তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন।

অবন্তী হাসে—কি বলে গেলেন, সেটা কি বলতে পারবে?

অনসূয়া—পারবো বৈকি।

অবন্তী হাসে—তাহ'লে বলে যাও।

অনসূয়াও হাসে।—আমি যে-কথা স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারি না, সেই কথাই বলে গেলেন।

অবন্তীর চোখ দুটো থরথর ক'রে কাঁপে, তার পর একেবারে ভিজেই যায়।—স্পষ্ট করে বলেই ফেল অনসূয়া, যদিও জানি ভদ্রলোক কি বলেছেন।

অনসূয়া—জান না বোধ হয়।

অবন্তী—খুব জানি। কিন্তু তুমি কি বলেছ জানি না, বুঝতেও পারছি না।

অনসূয়া হাসে—আমি শেখরবাবুকে আমার বিয়েতে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করেছি।

অবন্তী—কি বললে? তোমার বিয়ে?

অনসূয়া হাসে—তোমাকেও কি নেমন্তন্ন করবো না বলে সন্দেহ করছো?

অবন্তী—না, সে সন্দেহ নয়। কার সঙ্গে তোমার বিয়ে?

অনসূয়া—তা'ও জানতে পারবে।

অবন্তী—ভদ্রলোকের নাম?

অনসূয়া—নিখিল মজুমদার। দাদার বন্ধুর ভাই।

অবন্তীর দুই চোখের সন্দেহ যেন অগাধ বিস্ময়ের আবেগ হয়ে শুধু জ্বলজ্বল করতে থাকে। গম্ভীর মুখের সেই ভয়ানক সন্দেহের গুমোট

হঠাৎ যেন এই পৃথিবীর একটা মিষ্টি বিদ্রূপের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। শুধু অনসূয়াকে নয়, মনে মনে এই মুহূর্তে যেন নিখিল মজুমদারের অকৃতজ্ঞ মনটাকেও অভিনন্দিত করতে ইচ্ছে করছে। অনসূয়া যে সত্যিই অবন্তী সরকারকে মুক্তির আশ্বাস শুনিয়ে দিচ্ছে। না, ভুল করেনি শেখর মিত্র, ভুল করেনি অনসূয়া, ভুল করেনি নিখিল মজুমদারও।

অনসূয়া—শুনে খুশি হলে তো অবন্তী?

চেঁচিয়ে ওঠে অবন্তী—তুই আমাকে আর কত অপমান করবি অনসূয়া? তোর বিয়ের কথা শুনে আমি খুশি না হলে এই দুনিয়াতে আর কে খুশি হবে বল দেখি।

অনসূয়াও হাসে।—কিন্তু আমি খুশি হব কবে?

অবন্তী—তার মানে?

অনসূয়া—তুই বিয়ে করবি কবে?

অবন্তী—আমি? আমাকে বিয়ে করবে কে? যমে?

অনসূয়া হাসে—থাক্, এত অভিমান করিস না অবন্তী।

অবন্তী গম্ভীর হয়—না ভাই, অভিমান করবারও জোর নেই আমার।

অনসূয়া—কি বললি? মনে হচ্ছে, সত্যিই কারও ওপর তোর অভিমান আছে।

অবন্তী—না, অভিমান নয় অনসূয়া। তার ক্ষমা চাইবারও জোর পাচ্ছি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অবন্তী। পথ হারিয়ে যায় নি। কিন্তু পথটাই যে অদ্ভুত। কেমন করে এগিয়ে যাওয়া যায়? সেই সাহসই বা কোথা থেকে পাওয়া যায়? অবন্তী সরকারের সুন্দর কালোচোখের আশা আর সাহস যেন একটা অবসাদের বেদনায় ডুবে গিয়েছে।

কিন্তু হেসে উঠেছে অনসূয়ার চোখ। আর কোন সন্দেহ নেই অনসূয়ার। মিথ্যে সন্দেহ করেছে শেখর মিত্র। শেখর মিত্রেরই

চোখ নেই। আজ এখানে থাকলে নিজেই দেখে লজ্জা পেত শেখর মিত্র। শেখর মিত্রকে ভালবাসবার জন্য কী গভীর ব্যাকুলতা থমকে রয়েছে এই ভয়ানক চালাক অবন্তীরই চোখে। অনসূয়া বলে—একটু চা খাও অবন্তী।

অনসূয়ার অনুরোধ শোনা মাত্র ছটফট করে ওঠে অবন্তী—না না, আমার সময় নেই অনসূয়া। কিছু মনে করো না।

চলে গেল অবন্তী। দেখে বোঝা যায় না, কোথাও পালিয়ে গেল, না কারও কাছে ছুটে চলে গেল অবন্তী।

চব্বিশ

রতনবাবুর ছেলে শেখরের চোখের সামনে বসে কঠিন গণিতের ফরমুলা বুঝতে গিয়ে হিমসিম খায়। পাতার পর পাতা অঙ্কে অঙ্কে ভরে যাচ্ছে, তবু কঠিন গণিতের প্রবলেম সমাধান হবে বলে মনে হয় না। টিউটর শেখরও আনমনার মত তার জীবনের সমস্যাটা চিন্তা করে; কোন ফরমুলাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমাধান করবার কোন আশাই দেখা যায় না।

শুধু কঠিন একটা ঘৃণা ছটফট করে নিজের মনের ভিতরে। এ কি অদ্ভূত এক হীনতার চক্রান্তে স্বীকৃতি জানিয়ে অবন্তী সরকার নামে এক নারীকে আশ্বাসে খুশি ক'রে চলে এসেছে শেখর? অদ্ভূত একটা মেরুদণ্ডহীন হিরোইজম; শেখর মিত্র তার জীবনের পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে এক নারীর সুন্দর দুটি কালো চোখের কপট অশ্রুর দাস হবার জন্য কথা দিয়ে এসেছে। যত খুশি নিজের ক্ষতি ক'রে অবন্তীর কালো চোখের স্বপ্নের বিলাস-লীলাকে সাহায্য করা যায়, সে অধিকার শেখরের আছে। কিন্তু শেখরের হৃৎপিণ্ডটাই যেন হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙ্গে আর মোহ ছিঁড়ে জেগে উঠেছে, বুঝতে পেরেছে শেখর, অবন্তীকে সুখী করবার জন্য পরের ক্ষতি করবার কোন অধিকার তার নেই। নিখিল মজুমদারের ইচ্ছার পথে কাঁটা ছড়িয়ে

দেবার, আর অকারণে বেচারা অনসূয়ার মনের শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে তার মনে শেখরের সম্পর্কে একটা ইচ্ছা জাগিয়ে তুলবার হীন সঙ্কল্পকে এই মূহূর্তে চূর্ণ ক'রে দিতে হবে। ব্যস্তভাবে, চোখের দৃষ্টি উতলা ক'রে, কি যেন খুঁজতে থাকে শেখর। ছাত্র প্রশ্ন করে—আপনার শরীরটা আজ ভাল নয় বলে মনে হচ্ছে শেখরদা।

শেখর বলে—আমাকে এক টুকরো কাগজ আর তোমার পেনটা দাও। একটা দরকারি চিঠি লেখবার আছে।

কাগজ আর পেন শেখরের হাতের কাছে রেখে দিয়ে ছাত্রও অনুমতি চায়—আজ এখন তাহলে আমিও উঠি শেখরদা।

এস। ছাত্রকে বিদায় দিয়ে সেই পড়ার ঘরের নিভৃতে একেবারে একলাটি হয়ে শেখর মিত্র তার মনের বিদ্রোহ ছোট একটি চিঠির মধ্যে তিনটি লাইনে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় যেন উৎকীর্ণ ক'রে দেয়।

অসম্ভব অবন্তী। তোমার অনুরোধ রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার নেই। তোমাকে মুর্খের মত ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু সেই ভালবাসার জন্য মুর্খ হতে পারবো না। নিখিল হোক, অনসূয়া হোক, পৃথিবীর যে কেউ হোক, কারও ক্ষতি করতে পারবো না। তাতে তুমি সুখী হও বা না হও।

চিঠিটার মধ্যে জ্বালা আছে। চিঠিটাকে বেশিক্ষণ পকেটে রাখতেও অস্বস্তি হয়। এই মুহূর্তে ঐ চিঠিকে পার করে দেওয়াই উচিত।

রতনবাবুদের বাড়ির গেট পার হয়ে যখন পথের উপর এসে দাঁড়ায় শেখর, তখন এলগিন রোডের বড় বড় কৃষ্ণচূড়ার উপর দুপুরের রোদ ঝলক দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আর বেশি দূর নয় পোস্ট অফিস। ঐ চিঠিকে এই মুহূর্তে অবন্তী সরকারের কালো চোখের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিয়ে মুক্ত হয়ে যাবে শেখর। জানুক অবন্তী সরকার, শেখর মিত্রের মহত্ত্বটা খুব বেশি মুর্খ নয়।

শেখরের এই আসন্ন মুক্তির লগ্নটাকেই যেন একটা ক্ষেপা হাওয়ার আঘাতে হু হু ক'রে উড়িয়ে দিয়ে একটা ট্যাক্সি শেখরের প্রায় গা ঘেঁষে ছুটে চলে যায়, এবং তার পরেই আচমকা থেমে যায়।

সামান্য একটু দূরে গিয়ে গাড়িটা থেমেছে। গাড়ি থেকে নেমেছেন এক মহিলা। চলে গেল ট্যাক্সি। মহিলা চুপ ক'রে ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরেই শেখরের চোখের কঠিন দৃষ্টি হঠাৎ চমকে উঠেই বুঝতে পারে, দাঁড়িয়ে আছে অবন্তী সরকার। কোন সন্দেহ নেই, লালচে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে শেখরের জন্য দাঁড়িয়ে আছে অবন্তী।

শেখর কাছে আসতেই অবন্তী বলে—যাচ্ছিলাম টালীগঞ্জ। আপনারই কাছে।

শেখর হাসে—খুব আশ্চর্যের কথা।

অবন্তী—আরও আশ্চর্যের কথা বলবো ?

শেখর—কি ?

অবন্তী—এখনি একবার আমাদের বাড়িতে আপনাকে যেতে হবে।

শেখর—কেন ?

অবন্তী—কথা আছে।

শেখর—এখানেই বল।

অবন্তী ভ্রূকুটি করে।—এখানে বলা যায় না।

শেখর—খুব বলা যায়। আমার কাছে তোমার বলবার মত এমন কোন কথা নেই, যা এখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না।

অবন্তীর ভ্রূকুটি আরও কঠোর হয়ে ফুটে ওঠে।—শুনে সুখী হলাম। দু'দিনের মধ্যেই একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছেন।

কোন উত্তর দেয় না শেখর। এবং অবন্তীর মুখের দিকে তাকাতেও ভুলে যায়। মনে হয়, কৃষ্ণচূড়ার ছায়াতলে একেবারে একলা দাঁড়িয়ে আছে শেখর। একটা খোঁড়া ভিখারী লাঠি ঠুকে ঠুকে কাছে এসে দাঁড়িয়ে সুর ক'রে আবেদন জানায়—ভগবান আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। খোঁড়াকে মুড়ি খেতে পয়সা দিন বাবা।

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে অবন্তী—খোঁড়াকে দুটো পয়সা দিন তাহলে। ও কি বলছে, শুনতে পাচ্ছেন না ?

শেখর বলে—কিছু মনে করো না, আমি চলি।

অবন্তীর চোখ দুটো হঠাৎ গম্ভীর হয়। গলার স্বরটাও অস্বাভাবিক রকমের কঠোর।—একটু দাঁড়ান। সামান্য একটা জিজ্ঞাস্য আছে।
শেখর—বল।
অবন্তীর কালো চোখ এইবার যেন দপ ক'রে জ্বলে ওঠে।—অনসূয়াকে বিয়ে করবার কথা ভাবতে আপনার মনে একটু লজ্জাও হচ্ছে না?
শেখর—কি বললে?
অবন্তী যেন বিকার রোগীর প্রলাপের মত বিড় বিড় ক'রে অথচ দম বন্ধ ক'রে বলতে থাকে।—আপনি খুব মহৎ। আর, খুব মহৎ বলে আপনার মনে বড় অহংকার আছে। কিন্তু··শুধু আমার একটা অনুরোধের জন্য. আমার একটা বিশ্রী খেয়ালের জন্য আপনি নিজেকে একেবারে বাজে···একটা ছোট মনের লোকের মত···।
শেখর—চুপ কর অবন্তী।
অবন্তী—ধমক দেবেন না। আমাকে ধমক দেওয়া আপনার মত দুর্বল মানুষের একটুও সাজে না।
পকেট থেকে চিঠিটা বের ক'রে অবন্তীর হাতের কাছে এগিয়ে দিতেই যেন ভয়ে চমকে ওঠে অবন্তী। হাত কাঁপে। তারপর সেই কাঁপা হাতেই চিঠিটা তুলে নেয়।
কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার কাছে একা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকে অবন্তী। এবং অন্যদিকে না তাকালেও বুঝতে পারে, হন হন ক'রে হেঁটে চলে গেল শেখর।

পঁচিশ

টালীগঞ্জের গলির ভিতরে ক্ষুদ্র বাড়ির জানালায় বিকালের রোদ লুটিয়ে পড়েছে। বাড়ির দরজার কাছে পথের উপর ঘুর ঘুর করছে মধু আর বিধু। বার বার গলির মুখের দিকে ওরা তাকায়, যেখানে বড় রাস্তার এক টুকরো ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় বাস

যায়, ছোট মোটর গাড়ি যায়, আর সাইকেল ও রিক্সা। পথের ভিড়টাও যেন স্রোতের মত গড়িয়ে চলেছে। আজ রেসের দিন। হাঁক দিয়ে, রেসের বই বিক্রি করছে ফেরিওয়ালা ; সেই হাঁকও শোনা যায়।

এগিয়ে আসছে শেখর, দেখতে পায় মধু আর বিধু। সেই মুহূর্তে দুজনে একসঙ্গে ছুটে শেখরের দিকে এগিয়ে যায়, যেন কোন অভিনব বার্তা শোনাবার জন্য এতক্ষণ ধরে এই ভাবে শেখরের আসার আশায় পথের উপর ঘুর ঘুর করছিল ওরা।

মধু বলে—একজন মহিলা তোমার জন্যে বসে আছেন, বড়দা।

বিধু বলে—অনেকক্ষণ হলো বসে আছেন।

শেখরের চোখে আতঙ্কের ছায়া শিউরে ওঠে। মধু আর বিধুও বড়দার মুখের ভাব দেখে হঠাৎ অপ্রস্তুতভাবে তাকিয়ে থাকে। সন্দেহ করে, সুসংবাদটা বোধ হয় ভয়ানক একটা দুঃসংবাদ। নইলে বড়দা অমন ক'রে চমকে উঠবে কেন ?

শেখর বলে—মা কোথায় ?

মধু—মা ভবানীপুরে দিদির বাড়িতে গিয়েছেন।

শেখর—কেন ?

বিধু—অনসূয়াদির বিয়ের কথা শুনতে।

শেখর—বাবা কোথায় ?

মধু—অফিসে গিয়েছেন।

শেখর—মহিলা তোমাদের সঙ্গে বোধ হয় অনেক গল্প করেছে ?

বিধু—ওঃ, অনেক গল্প !

মধু—আমাকে ভূগোলের বই থেকে কত প্রশ্ন করেছেন, আমি সব ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছি।

শেখর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবে। তারপরেই দু'চোখের একটা তীব্র দৃষ্টিকে যেন আরও ভয়ানক রকমের তীক্ষ্ণ ক'রে বলে—আমি কি কাজ করি, কত মাইনে পাই, বাবা কি করেন, কত টাকা মাইনে পান, এই সব কথাও নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করেছে ?

মধু সন্দিগ্ধ হয়ে, আর একটু ভয় পেয়ে বলে – হ্যাঁ।
বিধু উৎফুল্ল হয়ে বলে – আমি সব ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছি।
সেইরকমই স্তব্ধ হয়ে থমকে থাকে শেখর। তারপর অসার কৌতুকে ধিক্কৃত নিজের এই ভাগ্যকেই মনে মনে ধিক্কার দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।
বিধু ভয় পেয়ে বলে ওঠে—মহিলা খুব ভাল লোক বড়দা। আমাকে আদর করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছেন। দু'চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়েছে।
হ্যাঁ, সেই জল অশ্রুর বিদ্রুপ জোর ক'রে এখানে এসে ঢুকেছে। কি দুঃসাহস। চেঁচিয়ে ওঠে শেখর – কি ?
বিধু- হ্যাঁ বড়দা, মহিলা বলেছেন, ভগবান বড় দুষ্টু, নইলে তোমাদের এত কষ্ট দেবে কেন ?
শেখর –তোমরাও নিশ্চয় ওর কাছে অনেক বাজে কথা বলেছ ?
মধু বলে – আমি বলিনি বড়দা, বিধুই বলে দিয়েছে, বাবা কতবার না খেয়ে অফিসে গিয়েছে, মা'র জ্বরের সময় ওষুধ কেনবার পয়সা ছিল না।
বিধু রাগ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে।—মহিলাই যে জিজ্ঞাসা করলেন।
স্তব্ধ হয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শেখর। তারপর কুণ্ঠিতভাবে দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতরে চলে যায়।
বারান্দার উপর টুলের উপর বসে বই পড়ছে অবন্তী সরকার। চৈত্রের রোদে ঝলসানো আর ঝড়ে আহত রঙীন পাখীর মত ক্লান্ত বিষণ্ণ ও ছেঁড়া-ছেঁড়া মূর্তি। তবু শেখরকে দেখে সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে অবন্তী।
অবন্তী বলে—আবার আপনাকে আশ্চর্য ক'রে দিলাম।
শেখর—সত্যি কথা।
অবন্তী—অনসূয়াদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। একটা সুসংবাদও শুনে এলাম।
শেখরের চোখে কৌতূহলের চমক লাগে—কিসের সুসংবাদ ?

খিল খিল ক'রে হেসে অবন্তী বলে—অনসূয়ার সঙ্গে নিখিলের বিয়ের তারিখও প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে।

হাসছে অবন্তী। যেন ওর মাথার উপর থেকে ভয়ানক একটা শাস্তির বোঝা নেমে গিয়েছে। বোধহয় একেবারে হালকা হয়ে গিয়েছে অবন্তীর জীবনটাই, তাই অবাধে খিল খিল ক'রে মুক্তির হাসি হাসছে।

শেখর বলে—মধু আর বিধু কি তোমাকে চা খাওয়াবার চেষ্টা করেছে ?

অবন্তী হাসে—অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমিই রাজি হইনি।

শেখরও হাসে—তাহলে আমি চেষ্টা করি।

অবন্তী—না।

অপ্রসন্নভাবে অবন্তীর মুখের দিকে তাকায় শেখর। দুঃসহ রকমের একটা অস্বস্তিও বোধ করে। এটা এলগিন রোডের ফুটপাথ নয়, শেখরেরই গৃহনীড়ের একটি নিভৃত কোণ। এখানে দাঁড়িয়ে অবন্তী সরকারকে কোন সত্য কথা একটু স্পষ্ট ক'রে বলে দিতে হলে শেখরকে এই মুহূর্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভদ্র হবার মত শক্তি পেতে হবে। কিন্তু তাও যে সম্ভব নয়।

অবন্তী—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন ? নতুন ক'রে কিছু দেখবার নেই।

বলতে গিয়ে অবন্তীর কথাগুলি যেন যন্ত্রণাক্ত স্বরে থর থর করতে থাকে ; এবং শেখরও চমকে ওঠে, হ্যাঁ একটা নতুন জিনিস বটে। অবন্তী সরকারের চোখের দৃষ্টি যেন ক্রুদ্ধ আগুনের শিখার মত জ্বলছে। অবন্তী বলে—আপনার চিঠি পড়েছি। আপনি মহৎ, আপনি আমার অনুরোধের চক্রান্তে পড়েও সে মহত্ত্বকে একটুও খাটো করতে পারেননি। সবই বিশ্বাস করি। আপনি বোকা নন, তাও খুব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনি একটি ভয়ানক···।

শেখর ভ্রূকুটি করে—তুমি অনর্থক রুষ্ট হয়ে···।

অবন্তী—ছি ছি, মানুষ নিজের এরকম সর্বনাশও করে !

শেখর—কার সর্বনাশ হলো ?

চেঁচিয়ে ওঠে অবন্তী—তুমি আমার কথার মায়ায় পড়ে কেন নিজের এই দশা করলে ?

দুহাত তুলে মুখ ঢাকা দেয় অবন্তী, আর সারা শরীরটাই যেন ফুঁপিয়ে ওঠে। বুকের ভিতরে গোপন করা একটা গর্বের কৌতুক যেন নিজের ভুলের নিষ্ঠুরতায় ভেঙে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অবন্তী সরকারের অন্তরাত্মা অসহ্য যন্ত্রণায় শোণিতাক্ত হয়ে উঠেছে, নইলে চোখের জলে ভিজে যায় কেন অবন্তী সরকারের দুই হাত ?

আশ্চর্য হয় শেখর—কি হলো অবন্তী ?

অবন্তী—মাপ কর শেখর ; আমি কোন দিন কোন স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারিনি যে, অবন্তী সরকারের মত একটা মেয়ের জন্য একটা মানুষ অনর্থক এই ভয়ানক শাস্তি নিজেকে দিতে পারে। তুমি যে বুকের রক্ত উপহার দিয়ে আমাকে ভালবেসেছ শেখর।

শেখর বিব্রতভাবে বলে—তুমি একটু বাড়িয়ে ভাবছো অবন্তী।

অবন্তী—নিজের ভাগ্য বলি দিয়ে আমাকে সুখের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে, তুমি উপোস করেছ, নিজের বাপ-মা-ভাইদের সুখের আশা ছিঁড়ে তাদেরও উপোস করিয়েছ···ছি ছি ছি, এরকম একটা পাপও মানুষে করে ! আমার কাশীপুরের গলির সেই ত্রিশ টাকার ভাড়াটে বাড়ি যে তোমার এই বাড়ির চেয়ে অনেক বড়লোক ছিল।

অবন্তীর কথার জ্বালাটা শেখরের মনের ভিতরে গিয়ে একটা প্রদাহ ছড়ায় ; অস্বীকার করে না শেখর, কথাটা মিথ্যে বলেনি অবন্তী।

চোখ মোছে অবন্তী—রাগ করো না। আমি জানি, তুমি কেন এই ভুল করলে ?

শেখর—কেন ?

অবন্তী—আমাকে ভালবাসবার ভুলে।

শেখর—তা সত্যি। কিন্তু···।

আর কোন কিন্তু নেই শেখর। আস্তে আস্তে শেখরের কাছে এগিয়ে আসে অবন্তী। মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। অবন্তী বোধহয়

বুঝতেও পারে না যে, শেখরের একেবারে বুকের কাছে এসে সে দাঁড়িয়েছে। মেঝের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে থাকে অবন্তী, তা সে-ই জানে।

শেখর বিব্রতভাবে ডাকে—অবন্তী।

অবন্তী—তোমার এই ডাক শুনেই চলে যাব শেখর। আর কিছু বলো না।

শেখরের চোখ করুণ হয়ে ওঠে—কেন?

অবন্তী—আজ বোধহয় তোমাকে ভালবাসবার মত মন পেয়েছি।

অবন্তীর হাত ধরে শেখর। হেঁট মাথা না তুলে আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নেয় অবন্তী।—কিন্তু তুমি আবার ভুল ক'রে আমাকে বিশ্বাস করো না শেখর।

অবন্তীর হেঁট মাথা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে শেখর। অবন্তী বলে—ভুল করো না।

অবন্তীর এই আত্মধিক্কারের ভাষাকেই অবিশ্বাস ক'রে শেখরের চোখে মুখে আর দুই হাতের আগ্রহে যেন বিপুল এক বিশ্বাসের ঝড় উথলে উঠতে চাইছে। অবন্তীর মুখটাকে তুলে ধরতে চায় শেখর। না শেখর। ক্ষমা কর।

জোর ক'রে মুখ নামিয়ে নেয় অবন্তী। চুপ। পিছনে সরে গিয়ে শান্ত ভাবে বলে—পারবো না শেখর! আমার মাথা বড় বেশি হেঁট ক'রে দিয়েছ তুমি। তুমি বড় বেশি মহৎ। তুমি অবন্তীর সব দোষ ভুলে গিয়ে কাছে টানছো, সে তোমার দয়া।

শেখর—তোমার ভুল সন্দেহ অবন্তী।

অবন্তী হাসে—না শেখর, সত্যিই তোমার ভালবাসাকে একটা মস্ত বড় দয়া বলে মনে হচ্ছে। আমার সব অহংকার মিথ্যে করে দিয়ে তোমার দয়া নিতে পারবো না।

শেখর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পাঁচিলের বাইরে ঐ মাঠের গাছগুলির ভিড় থেকে আরও দূরে এক ফালি খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।—আমার আর কিছু বলবার নেই অবন্তী।

অবন্তী—আমি নিজেকেই সন্দেহ করেছি শেখর, তোমাকে নয়। এত সস্তায়, বলতে গেলে বিনা দামে তোমার কাছ থেকে এত দামী জিনিস পেতে চাই না শেখর। অথচ, দাম দেবার সামর্থ্যও নেই তোমার ক্ষতি হবে এই আমার ভয়। তাই···।

আর কোন কথা বলে না অবন্তী। বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে নেমে পড়ে। দেখতে পায় শেখব, সেই এক ফালি আকাশের উপর দিয়ে সরু সরু মেঘের কতকগুলি রেখা ভেসে যাচ্ছে। একেবারে সাদা, তুলোব মত হালকা কতকগুলি মেঘের রেখা।

ছাব্বিশ

জেনারেল ম্যানেজার বলেন—বিলেত যাবেন মিস সরকার?

অবন্তী হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে।—এই প্রশ্ন কেন করছেন স্যাব? বিলেত যাবার টাকা কোথায পাব?

হেসে ফেলেন জেনারেল ম্যানেজার—আমি চেষ্টা করলে পাবেন না কেন? কোম্পানিই খরচ দেবে। রাজি থাকেন তো বলুন।

অবন্তী—কোম্পানির কোন কাজে বিলেত যেতে হবে?

জেনারেল ম্যানেজার জোরে হেসে মাথা দোলাতে থাকেন।—নো মিস, নো। আপনার নিজের কাজে।

অবন্তী—কোন কাজ শিখতে হবে?

জেনারেল ম্যানেজার—কিচ্ছু না।

অবন্তী—তা হলে?

জেনারেল ম্যানেজার—আমি যাব লণ্ডনে। ছ'টি মাস থাকবো। আমার সেক্রেটারি হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

চুপ ক'রে নিজের মনের বিস্ময় ছিন্ন ভিন্ন ক'রে বুঝতে চেষ্টা করে অবন্তী। আজ হঠাৎ জেনারেল ম্যানেজার বিশেষ এক জরুরি কাজে অবন্তীকে তাঁর প্রাইভেট কেবিনে আহ্বান করেছেন। আজ অফিসে এসেই টাইপিস্ট চারুবাবুর গম্ভীর কথাগুলির ভাষা

বুঝতে পেরেছে অবন্তী, জেনারেল ম্যানেজার সকাল আটটায় অফিসে এসেছেন, কিন্তু কোন ফাইল স্পর্শও করেননি। সেই সকাল আটটা থেকে তাঁর প্রাইভেট কেবিনে সোফার উপর এলিয়ে পড়ে আছেন। এখন স্বচক্ষেই দেখতে পায় অবন্তী, ঠিকই, জেনারেল ম্যানেজার জুতো সুদ্ধ পা সোফার উপর তুলে দিয়ে এলিয়ে বসে আছেন ; শরীরটাকে যেন অর্ধেক গড়িয়ে দিয়েছেন।

জেনারেল ম্যানেজার বলেন—এখন আপনি কত পাচ্ছেন ?

অবন্তী—তিনশো ষাট।

জেনারেল ম্যানেজার –এক হাজার পেলে খুশি হবেন ?

চমকে ওঠে অবন্তী সরকার—খুশি কেন হব না স্যার, কিন্তু কাজটা করতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না।

চেঁচিয়ে হেসে ফেলেন ম্যানেজার। তার পরেই ফিসফিস ক'রে বলেন—কাজ করতে বলছে কে আপনাকে ?

অবন্তী–আপনিই যে বললেন, সেক্রেটারির কাজ করতে হবে।

জেনারেল ম্যানেজার–তার মানেই হলো নো কাজ। আপনি বড় বেশি ইন্নোসেন্ট মিস সরকার।

অবন্তী—মাপ করবেন আমাকে।

জেনারেল ম্যানেজার আশ্চর্য হন–আপনি কি সত্যিই কোনরকম সন্দেহ করছেন ?

অবন্তী—হ্যাঁ, সন্দেহ হচ্ছে, মিছিমিছি বিলেত ঘুরে বেড়াতে পারবো না।

জেনারেল ম্যানেজার—তা হলে একটা কাজ নিয়েই বিলেত যান। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

অবন্তী--এ বিষয়ে আমার বাবার সঙ্গে আলোচনা না ক'রে আমি কিছু বলতে পারবো না স্যার।

জেনারেল ম্যানেজার—আপনার বাবাকে বলবেন যে···।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে অবন্তীর মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকেন জেনারেল ম্যানেজার। যেন অবন্তীর কালো চোখের

ছায়া-ছায়া রহস্যের মায়াময় শোভার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন। অবন্তীর কপালের উপর বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা হঠাৎ ফুটে উঠে চিকচিক করে।

জেনারেল ম্যানেজার —আপনার বাবাকে বলবেন যে, তাঁর মেয়েকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে এমন এক ব্যক্তি তার উপকার করতে চায়।···আমি অনেক দিন থেকে···যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছি অবন্তী, সেদিন থেকেই তোমার কোন উপকার করবার জন্য স্বপ্ন দেখছি।

এ কি বলছেন আপনি? শঙ্কিত হয়ে জেনারেল ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অবন্তী।

হ্যাঁ অবন্তী, আমি চাই না যে, তোমার মত মেয়ে তিনশো ষাট টাকা মাইনেতে বিজ্ঞাপন লেখার কাজ নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে। পাবলিসিটি সুপারভাইজার নামে একটা নতুন পোস্ট আমি তৈরী করেছি। তুমি বিলেত-টিলেত না গিয়েও এই পোস্টে কাজ করতে পার।

এ কাজটাই বা কেমন কাজ, আমি একাজ পারবো কিনা কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।

আবার বুঝতে ভুল করলে অবন্তী সরকার। আমি তোমার জন্যেই এই পোস্ট তৈরী করেছি। বলতে গেলে কোন কাজ করতেই হবে না, তারই নাম সুপারভাইজারের কাজ। ডিপার্টমেণ্টের অন্য লোকগুলোর ভুল-টুল ধরে মাঝে মাঝে এক আধটা হৈ-হুল্লোড় করলেই হয়ে গেল। মাইনে ছ'শো টাকা।

এই কাজটা নিয়ে শেষে কোন বিপদে পড়তে না হয় স্যার।

বিপদ? আমি থাকতে তোমার বিপদ? তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না অবন্তী সরকার।

ঠিক আছে স্যার। আমি কাজটা নেব। আপনার কাছে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো·· ।

ছিঃ অবন্তী সরকার, আমি তোমার কৃতজ্ঞতার ক্যানডিডেট নই।

আমি···আমি তোমারই ক্যানডিডেট।

কি বললেন ?

খুব স্পষ্ট করে বলে ফেলেছি অবন্তী। তুমি বোধহয় জান না যে, আমি একটা হতভাগ্য। আমার ছাব্বিশ বছর বয়সে আমার স্ত্রী আমাকে এই পৃথিবীতে একলা ছেড়ে দিয়ে অন্য জগতে চলে গিয়েছে। আজ আমার বয়স একচল্লিশ। এই পনর বছরের ইতিহাসে এমন একটা সুযোগও পেলাম না যে, কাউকে ভালবেসে সুখী হই। ভালবাসবার মত একটা মুখই দেখতে পাইনি। হ্যাঁ, জোর ক'রে বলবো, আজ দেখতে পেয়েছি। সে মুখ হলো তোমার মুখটি।

স্যার।

সন্দেহ করো না অবন্তী। আমার টাকার অভাব নেই। আমার ক্ষমতার অভাব নেই। তোমাকে সুখী করবার মত আর একটি জিনিস আমার আছে···আমার এই হার্ট। জানি, লোকে আড়ালে আড়ালে হেসে হেসে নিন্দে করবে, দি এগ্রি-মেশিনারি লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার কিনা অফিসের একটা মেয়ে-কেরানিকে বিয়ে করলো। কিন্তু সেই নিন্দেকে আমি সোনার মুকুটের মত মাথায় তুলে নেব অবন্তী।

মাপ করবেন স্যার।

না, মাপ করতে পারবো না। জেনারেল ম্যানেজারের চোখ ধকধক করতে থাকে।

অবন্তী—মাপ করতেই হবে ; আমাকে আর ওসব কথা বলবেন না।

জেনারেল ম্যানেজার কিছুক্ষণ চোখ ছোট ছোট ক'রে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর বলেন—মাপ করতে পারি, সত্যি প্রাণ খুলে মাপ ক'রে তোমাকেই টাকা-পয়সায় সুখী ক'রে দিতে পারি, যদি তুমি···তুমি নিশ্চয় আমার কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারছো অবন্তী।

জেনারেল ম্যানেজার হঠাৎ তাঁর অলস শরীরটাকে মোচড় দিয়ে

টান হয়ে উঠে দাঁড়ান। অবন্তীর দিকে যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অবন্তীর একটা হাত ধরে ফেললেন।—এমন কিছুই দাবি নয় অবন্তী। অফিস ছুটির পর সন্ধ্যাবেলা শুধু আমার সঙ্গে বান্ধবীর মত একটু বেড়িয়ে আসা, সপ্তাহে একটা দুটো সন্ধ্যা শুধু কোন একটা ভাল বারে বসে একটু ড্রিংক, কিংবা কোন ভাল ছবি দেখতে···।

হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে অবন্তী। কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার যেন বাঘের থাবার মত কঠোর আগ্রহে অবন্তীর হাতটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। অবন্তীর মুখের উপর জেনারেল ম্যানেজারের হাপরের মত বুকটার ভিতর থেকে নিঃশ্বাসের বাতাস থেকে থেকে দমক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই নিঃশ্বাসের বাতাস মদের গন্ধের ঝাঁজে উগ্র হয়ে রয়েছে।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবন্তী বলে—হাত ছেড়ে দিন, আমাকে যেতে দিন।

জেনারেল ম্যানেজার—কথা দিয়ে যাও।

অবন্তী—কোন কথা নেই। আমাকে অপমান করবেন না।

জেনারেল ম্যানেজার—লাইফের এত বড় প্রসপেক্ট নষ্ট করো না মিস অবন্তী সরকার।

অবন্তী ভ্রূকুটি করে—প্রসপেক্ট?

জেনারেল ম্যানেজার—হ্যাঁ, শুধু সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে এক দুই ঘণ্টার মত বন্ধু হবে, তার জন্য তুমি প্রতি সন্ধ্যার ফী হিসাবে আমার কাছ থেকে নগদ নগদ পঞ্চাশ টাকা পাবে। অন্য ফুর্তির সব খরচ আমার। বল?

কোন উত্তর দেয় না অবন্তী। অবন্তীর সেই কালো চোখের বুদ্ধির দীপ্তি যেন হিংস্র হয়ে জ্বলতে থাকে।

অবন্তী বলে—হাত ছাড়ুন, আমি উত্তর দিচ্ছি।

অবন্তীর হাত ছেড়ে দিয়ে আবার সোফার উপর এলিয়ে পড়েন জেনারেল ম্যানেজার, এবং দেরাজ খুলে গেলাস বের করেন।

অবন্তী বলে—আমি চলি।

চেঁচিয়ে ওঠেন জেনারেল ম্যানেজার—পঞ্চাশ নয়, একশো টাকা ক'রে দেব মিস সরকার। প্রতি সন্ধ্যায় একশো টাকা। থিংক অব ইট।

অবন্তী—আপনার মাইনে তো মাসে আড়াই হাজার টাকা। সন্ধ্যা বেলার ফূর্তির জন্য এত টাকা, এরকম হাজার হাজার টাকা কোথা থেকে পাবেন?

জেনারেল ম্যানেজারের চোখ মুখ একসঙ্গে হেসে ওঠে।—তাই বল। তোমার সন্দেহ হয়েছে, আমি এত টাকা পাব কোথায়? তাই না?

অবন্তী—হ্যাঁ।

জেনারেল ম্যানেজার—মহামান্য সরকার উদার হস্তে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে এই হতভাগা কোম্পানিকে সাহায্য করেছেন। কোম্পানির ভাগ্যের জন্য আই কেয়ার এ ব্রাস পেনি। আপাতত টাকাগুলো নিয়ে আমি নিজেকেই ইচ্ছামত সাহায্য করছি···তুমি আর কত পেলে খুশি হবে গুড গার্ল?

জেনারেল ম্যানেজারের এই অভিশপ্ত প্রাইভেট কেবিনের দরজার পর্দাটার দিকে একবার তাকায় অবন্তী সরকার। তার পরেই, চতুর পাখির মত যেন ডানার ঝাপটের মত একটা শব্দ ছড়িয়ে এক নিমেষে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়।

সাতাশ

রতনবাবুর ছেলে পাস করেছে, বেশ ভাল মার্ক পেয়ে পাস করেছে। বড় খুশি হয়ে রতনবাবু তাঁর এলগিন রোডের প্রকাণ্ড বাড়ির বাগানে পায়চারি করছিলেন, এবং মনে মনে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন, শেখর নামে সেই ইয়ং ম্যানকে, তাঁর ছেলের টিউটর শেখর মিত্রকে। শেখরকেই সাক্ষাতে একটা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন রতনবাবু। নইলে, এতক্ষণে তিনি শালকিয়াতে

তাঁর কারখানায় চলে যেতেন।

শেখরও আসতে দেরি করেনি। এবং শেখরকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে মহা খুশির আবেগে বিহ্বল হয়ে কোলাকুলি করলেন রতনবাবু।—তোমার জন্যই, তুমি এত ভাল ক'রে পড়িয়েছ বলেই ছেলেটা পাস করতে পেরেছে শেখর।

শেখর হাসে—আমার ছাত্রও বেশ ইন্টেলিজেন্ট, কাকাবাবু।

রতনবাবু—যাই হোক, আমি কিন্তু তোমার ছাত্রের কাছ থেকে কতকগুলো খবর জানতে পেরে বড় দুঃখিত হয়েছি।

শেখর—কি ?

রতনবাবু—তুমি নাকি আজকাল তিন জায়গায় ছেলে পড়াতে শুরু করেছ ?

শেখর—হ্যাঁ, এতে দুঃখিত হচ্ছেন কেন কাকাবাবু ?

রতনবাবু—তোমার মত এত ব্রিলিয়েট স্কলার শুধু কয়েকটা ছেলে পড়িয়ে দিন পার ক'রে দেবে, ভাবতে আমার বেশ খারাপই লাগছে শেখর।

শেখর—উপায় নেই, তাই বাধ্য হয়ে···।

রতনবাবু—আমি তাই ভেবে দেখেছি, আর আমাদের দেবকীবাবুকে বলেও রেখেছি। তাঁর কেমিক্যাল ওয়ার্কসের লেবরেটরিতে অ্যাসিস্টেন্ট রিসার্চ অফিসার হিসাবে তোমাকে নিতে তিনি রাজি হয়েছেন। শ'তিনেক টাকা মাইনে, ভবিষ্যতে উন্নতিও আছে।

শেখর—আপনার শুভেচ্ছাই যথেষ্ট কাকাবাবু, কিন্তু আপনি আমার জন্য চাকরির চেষ্টা করবেন না।

রতনবাবু—কেন ?

শেখর—চাকরি করবার মত আর মন নেই।

রতনবাবু—তাই বা কেন ?

শেখর—কেউ যোগ্যতার বিচার করে না কাকাবাবু। কেউ দয়া ক'রে চাকরি দিতে চায়, কেউ বা ঘুস আশা ক'রে চাকরি দিতে চায়। ঐ দুই সর্তের একটিও স্বীকার করবার সামর্থ্য আমার নেই।

রতনবাবু—ঘুসের কথা ছেড়ে দাও, লোকের দয়ার উপর এত ঘৃণা কেন ?

শেখর—যোগ্যতার সম্মান না ক'রে দয়া করা মানে অপমান করা। এইরকম দুটো চাকরি অবশ্য পেয়েছিলাম। চাকরি দেবার কর্তারা আমার আবেদন ভেরি কাইণ্ডলি কনসিডার ক'রে ইণ্টারভিউ মঞ্জুর করেছিলেন। ভাগ্যি ভাল যে সে দুটো চাকরিও ভাগ্যে জোটেনি।

রতনবাবু—অদ্ভুত কথা।

শেখর—তা ছাড়া, গত মাসেও একটা চাকরি পেয়েছিলাম। আড়াইশো টাকা মাইনের একটা চাকরি। সাতটা দিন কাজও করেছিলাম। কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন যে, তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য ফার্নিচার কিনতে একটি হাজার টাকা চাই। এক মাসের মধ্যেই দিতে হবে, নইলে··· ।

রতনবাবু—নইলে কি ?

শেখর—নইলে তিনি ঐ পোস্টে আরও ভাল লোক নেবার জন্য চেষ্টা করবেন।

হেসে ওঠেন রতনবাবু—এই সামান্য একটা ব্যাপার দেখে তুমি ঘাবড়ে গেলে কেন শেখর ? সর্বত্র এই তো নিয়ম। টাকা না ছিল, আমার কাছে চাইলেই পারতে, আমি তোমাকে টাকাটা ধার বাবদ দিতাম।

শেখর—সে কথা মনেই হয়নি কাকাবাবু। বরং চাকরিটাকে ঘেন্না করতেই ভাল লাগলো। সেদিনই ছেড়ে দিয়ে হাঁপ ছাড়লাম'।

রতনবাবু শুকনো দৃষ্টি তুলে তাকান—তোমার কথাগুলি একটু দাম্ভিক দাম্ভিক হয়ে যাচ্ছে না কি শেখর ?

শেখর—আপনি ঠিকই বলেছেন কাকাবাবু, ঐরমকই মনে হয়। যে নিজেকে যথেচ্ছ অসম্মান করতে পারে, লোকে তাকে বিনয়ী বলে মনে করে।

রতনবাবু—তাহলে ছেলে পড়িয়েই জীবন কাটাবে ?

শেখর—হ্যাঁ, আর ম্যাথামাটিকস নিয়ে রিসার্চ করবো, সেটা কারও

দয়া না পেয়ে ও চালিয়ে যেতে পারবো।

রতনবাবু—অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে তুমি ভয় পেয়ে, পিছিয়ে গিয়ে, লুকিয়ে থাকতে চাইছো। তুমি আধুনিক যুগের উপযোগী নও শেখর।

শেখর হাসে—আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না কাকাবাবু।

ড্রাইভারকে গাড়ি বের করবার নির্দেশ দিয়ে রতনবাবু গম্ভীর ভাবে বলেন—যাই হোক, আই উইশ ইওর সাক্সেস।

রতনবাবু চলে যাবার পর ছাত্রের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আবার পথের উপর এসে কৃষ্ণচূড়ার মাথার উপর রোদ আর রঙের খেলা দেখতে দেখতে চলতে থাকে শেখর। সাকসেস? কে জানে ঐ অদ্ভুত কথাটার অর্থ কি? রতন কাকাবাবু কাকে সাকসেস বললেন, তা তিনিই জানেন। শেখর শুধু জানে যে, তার জীবনের সব আক্ষেপ মিটে গিয়েছে। অভিযোগগুলিও যেন বেদনা হারিয়ে ফেলেছে। দিন চলে যাচ্ছে। বেশ ভাল ভাবেই চলে যাচ্ছে। আর বুকের ভিতরেও যেন সোনালি রোদে ঝলমল লাল কৃষ্ণচূড়ার রং-এ ভরে গিয়েছে।

তিন বেলা তিন বাড়িতে ছাত্র পড়িয়ে যে টাকা পাওয়া যায়, সেটা যথেষ্ট কি অযথেষ্ট, তার বিচার করতেই ইচ্ছা হয় না। শেখর জানে যে, বাবা আজ তাঁর অনেকদিনের পুরনো একটা শখের কথা বলা মাত্র সেই শখের দাবি পূর্ণ করে দিতে পেরেছে শেখর। একটা সাদা শাল গায়ে দেবার শখ ছিল অনাদিবাবুর। এই পঞ্চাশ ষাট বা আশি টাকার মধ্যে একটা সাদা শাল। সেই শাল গায়ে দিয়ে পৌষের সকালে পার্কের আশে পাশে বেড়াতে ইচ্ছা করে অনাদিবাবুর। তাঁর সেই ইচ্ছা এতদিনে সফল হয়েছে। শেখর মনে করে, এই তো সাকসেস। একটা সামান্য বস্তুর কাছ থেকে অসামান্য প্রসন্নতা পেয়ে যাবার মত মনকে পাওয়া।

নিজেকেও অসামান্য মনে হয়? হ্যাঁ, হোক না দম্ভ। এমন দম্ভ ছাড়া জীবনটা খুশিই বা হবে কেন? শেখরের বুকের ভিতরে যে

পরিপূর্ণতার আনন্দ টলমল করে, এবং সেটা যে শেখরের জীবনের এক জয়ী ভালবাসার দম্ভ! চলে গিয়েছে, সরে গিয়েছে অবন্তী। মাসের পর মাস পার হয়ে গিয়েছে, পৃথিবীর কোথাও অবন্তীকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখে দেখতে পায়নি শেখর। অবন্তীর নামটাও কোথাও উচ্চারিত হতে শোনেনি। অবন্তীর গল্প কারও মুখে ধ্বনিত হয়নি। ভাবতে একটু অদ্ভুতই মনে হয়। অবন্তী শেখরকে ভাল-বেসেছে, তাই সরে গেল অবন্তী। শেখর অবন্তীকে ভালবেসেছে, অবন্তীকে তাই ধরে রাখতে পারলো না শেখর। ভালবাসার বন্ধন চরম ক'রে দেবার জন্য চরম ছাড়াছাড়িই শেষে সত্য হয়ে উঠলো! অদ্ভুত বটে! কিন্তু কি আশ্চর্য, মনে হয় শেখরের, শুধু মাঝ রাতের স্বপ্নছড়ানো ঘুমের মধ্যে নয়, এই জেগে থাকা কর্মকোলাহলের প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততার মধ্যে অবন্তী যেন শেখরের বুকের কাছে ঘুরছে। অবন্তীর খোঁপার সৌরভ নিজের নিঃশ্বাসের মধ্যেই যেন অনুভব করতে পারা যায়।

অবন্তীর হেঁট মাথা তুলে ধরতে, আর সেই কালো চোখের রহস্যের উপর ভালবাসার একটি তপ্ত ও সিক্ত স্পর্শ চিহ্নিত ক'রে দিতে চেয়েছিল শেখর। কিন্তু রাজি হয়নি অবন্তী, সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। দম্ভ আছে অবন্তীরও। বেশ তো। এমন দম্ভ অবন্তীর মত মেয়েকেই যে সবচেয়ে ভাল মানায়। ভালই করেছে অবন্তী।

এই তো প্রভাদের বাড়ি। হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চলে এসেছে শেখর। ভবানীপুরে প্রভাদের বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। এখানেই আজ একবার আসবার কথা ছিল। প্রভা লিখেছে অনসূয়া আজ শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে আসবে। তুমি এস একবার। বিয়ের দিন তুমি আসতে পারনি বলে বাড়ির সবাই দুঃখিত।

দুঃখিত হবারই কথা। প্রভাদের বাড়ির যে কেউ জানে না, অনসূয়ার বিয়ের দিন শেখরকে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত সময়টা একটা চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ দিতেই পার ক'রে দিতে হয়েছিল।

শেখর বাড়িতে ঢুকতেই প্রভা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—অনসূয়া এসেছে দাদা।

শেখর—স্বস্বামিক এসেছে, না একা ?

প্রভা—ঐ যে, তোমার কথা শুনেই এসে পড়েছে।

শেখরকে প্রণাম ক'রে অনসূয়া লজ্জিতভাবে হাসে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাদা মনের মানুষ অনসূয়া ভালবাসাবাসি নামে ঝঞ্চাটের কোন ধার না ধেরেও সুখী হয়েছে। ওর মুখের ঐ স্বচ্ছ সুন্দর লাজুক হাসিই বলছে যে···।

শেখরের ধারণাকে প্রভাই চেঁচিয়ে ঘোষণা ক'রে দেয়।—আজ কাল আর অনসূয়া বলে না যে, না জেনে শুনে বিয়ে করতে নেই।

অনসূার দিকে তাকিয়ে শেখর হাসে—তাই নাকি ম্যাডাম ?

অনসূয়া বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু আপনি যে জেনেশুনেও···।

অনসূয়াই যেন হঠাৎ সাবধান হয়ে গিয়ে কথাটা আর শেষ করে না। কিন্তু সেই অসমাপ্ত কথার অর্থটা যেন শেখরের বুকের ভিতরে গিয়ে চৈতী ঝড়ের মত মাতামাতি করতে থাকে।

চা আনতে চলে যায় প্রভা, এবং অনসূয়ার চোখের একটা ধূর্ত ইঙ্গিত লক্ষ্য ক'রে সেই মুহূর্তে ভিতরের ঘর থেকে এই ঘরে এসে প্রবেশ করে যে, সে হলো নিখিল মজুমদার।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিখিল—আপনার বোনের ননদের এখন ধারণা হয়েছে যে, বিয়ের পরেই চেনা-জানা হওয়া ভাল। সুতরাং আমিও আমার যত গল্প···।

নিখিলের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গী ক'রে অনসূয়া বলে—চুপ কর তুমি। অত কথা, আর শুধু নিজের কথা না বললেও চলবে।

কিন্তু অনসূয়ার বাধাকে তুচ্ছ ক'রে এবং আরও মুখর হয়ে নিখিল যেন নিজের মনের আবেগে বলতে থাকে।—আমি অনসূয়াকে না বলে থাকতে পারিনি। সবই বলে দিয়েছি। আমি যে কি পদার্থ, সেটা অনসূয়া ভাল করেই জানতে পেরেছে। কাজেই অনসূয়ার মনে না জানা-শোনার ভয় আর নেই শেখরবাবু।

অনসূয়া আবার বাধা দেয়—আঃ, থাম বলছি।

অনসূয়া আর নিখিলের চোখে চোখে যেন একটা নীরব চক্রান্তের ইশারা ছুটাছুটি করে। জানে না, কল্পনাও করতে পারে না শেখর, এই চক্রান্তের মধ্যে প্রভাও আছে। আজ এই ঘরের মধ্যে শেখরকে বিশেষ একটি অনুরোধের মায়া দিয়ে ঘিরে ধরবার, এবং শেখরের উদাস মনটাকে বিচলিত করবার জন্য একটি চক্রান্ত আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, তাই প্রভাও যথাসময়ে চিঠি দিয়ে শেখর মিত্রকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে।

অনসূয়া বলে—আপনি তো এই ভদ্রলোকের আর আমার অনেক উপকার করলেন, কিন্তু এইবার নিজের উপকার একটু করুন।

নিখিল—আমিও তাই বলি।

শেখর বিস্মিত হয়—কি বলছেন, বুঝলাম না।

নিখিলের মুখের হাসি যেন একটা হঠাৎ বেদনায় গম্ভীর হয়ে যায়।—আপনি বিশ্বাস করুন শেখরবাবু, আমি আর অনসূয়া দু'জনেই দুঃখিত, আমরা সত্যিই সহ্য করতে পারছি না যে, আপনি এখনও এরকম একা-একা···।

হেসে ওঠে শেখর—এইবার বুঝলাম, কেন প্রভা আমাকে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছে, আর কেনই বা আমার বোনের ননদ আর নন্দাই দু'জনে মিলে এখানে আমাকে বেশ একটু কর্ণার ক'রে···।

অনসূয়া—ঠিকই সন্দেহ করেছেন আপনি। কিন্তু আজ আর রেহাই পাবেন না।

শেখর—বল, কি করতে হবে ?

অনসূয়া—বলতে হবে।

শেখর—কি ?

অনসূয়া—অবন্তীকে আপনি বিয়ে করবেন .

শেখর গম্ভীর হয়।—তুমি সত্যিই না জেনে শুনে, অর্থাৎ কোন খবর জান না বলেই হঠাৎ এরকম অনুরোধ করতে পারছ অনসূয়া।

অনসূয়া মুখ টিপে হাসে—সব খবর জানি। আপনার গম্ভীর মুখটাকে

আর আমি বিশ্বাস করি না।

শেখর আশ্চর্য হয়।—কি জান?

অনসূয়া—জানি যে, অবন্তীর ওপর এত রাগ ক'রে থাকা আপনার আর সাজে না।

শেখর—আমি রাগ করেছি?

অনসূয়া—তা ছাড়া আর কি? আমরা কি কোন খবর রাখি না ভাবছেন? অবন্তী বেচারা আকুল হয়ে ছুটে গিয়েছে আপনার কাছে, আপনারই বাড়িতে, তবু আপনার অভিমান ভাঙ্গলো না?

শেখর—ভুল বুঝেছ অনসূয়া, অবন্তীর ওপর আমার কোন অভিমান নেই।

নিখিল বিষণ্ণভাবে বলে—এবং যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে যে···।

শেখর—অবন্তীর মন আমি জানি, আমার কোন সন্দেহ নেই নিখিলবাবু।

অনসূয়া—অবন্তী আপনাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করে।

নিখিল—ভালবাসেও।

শেখর আনমনার মত বিড়বিড় করে।—আমি তাই বিশ্বাস করি, কিন্তু অবন্তী নিজেই বিশ্বাস করে না।

নিখিল আর অনসূয়ার চোখে চোখে ইশারার চক্রান্ত হঠাৎ করুণ হয়ে যায়; দুজনেরই কল্পনার উল্লাস হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কি অদ্ভুত আর কি জটিল একটা মনের অভিশাপে পড়েছে অবন্তী সরকারের জীবনটা। নিজেরই ভালবাসবার আকুলতাকে বিশ্বাস করে না? তবে শেখর মিত্রের বাড়িতে কেন সেদিন ওরকম পাগলের মত অস্থির হয়ে ছুটে গিয়েছিল?

অনসূয়া ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—কি বলতে চায় অবন্তী।

শেখর—বলতে চায়, আমি রাজি হলেও সে রাজি হতে পারে না?

অনসূয়া—কি আশ্চর্য!

শেখর হাসে—আশ্চর্য হবার কিছু নেই অনসূয়া। অবন্তী কারও কাছে মাথা হেঁট করতে পারে না।

অনসূয়া—আপনাকে বিয়ে করলে অবন্তীর মাথা হেঁট হয়ে যাবে ?
শেখর—না, ঠিক তা নয়। আমার কাছে মাথা হেঁট করতে হয়েছে, তাই আমাকে বিয়ে করতে রাজি নয় অবন্তী।
অনসূয়া—অদ্ভুত অহংকার।
শেখর আবার হাসে—তা বটে ; কিন্তু মন্দ কি ?
প্রভা চা নিয়ে আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি করে ঘুরতে থাকে শেখর। ঘরের গম্ভীরতা দেখে প্রভার মুখের হাসিও নিষ্প্রভ হয়ে যায়।
চলি এবার। ছোট্ট একটা কথা বলে শেখর মিত্র ঘরের দরজা পার হয়ে চলে যেতেই নিখিল বলে ওঠে।—বুঝলাম, ইচ্ছে করে নিজেকে ভয়ানক শাস্তি দিল অবন্তী।

আঠাশ

পার্ক সার্কাসের একটি নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটের একটি সাজানো ঘরের দরজা থেকে চলে গেল যে লোকটা, সে হলো মিশন রো'র সেই অফিসের আরদালি। যাবার সময় আরদালি বলে গেল।—সাহেব বলেছেন, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে, তবে আলিপুরে সাহেবের বাড়িতে গিয়ে বলে আসবেন।
অবন্তী বলে—ঠিক আছে, তুমি যাও।
আরদালি বলে—সাহেব আমাকে জানতে বলে দিয়েছেন, আপনি যাবেন কি না, আর গেলে কখন যাবেন ?
অবন্তী বলে—সাহেবকে বলে দিও, আমি যাব না, তার কাছে গিয়ে কোন কথা বলবার দরকার আছে বলে মনে করি না।
বহুত আচ্ছা। চলে যায় আরদালি।
অফিসের চিঠিটা অবন্তীর হাতেই ছিল, আর ছিল একটি চেক। চিঠিটা হলো, অবন্তী সরকারের চাকরি খতম ক'রে দিয়ে একটা রিগ্রেটের চিঠি। আর চেকটা হলো অতিরিক্ত এক মাসের মাইনে।

চিঠিতে জেনারেল ম্যানেজারের সই। কোম্পানি সিদ্ধান্ত করেছে যে, পাবলিসিটি অফিসার নামে একটা পোস্ট রাখবার আর কোন দরকার নেই।

সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরের চারদিকে একবার তাকায় অবন্তী। কালো চোখের তারা দুটো জ্বলতে থাকে। গম্ভীর মুখটা ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠতে থাকে। তার পরেই চোখ জুড়ে একটা শান্ত স্নিগ্ধতা থমথম করতে থাকে। যেন এতদিনে অবন্তীর মাথার উপর একটা দুর্লভ আশীর্বাদের ধারা হঠাৎ ঝরে পড়েছে।

আর মনে হয়, একটা ফাঁকির প্রাসাদ ধূলো হয়ে ঝরে পড়লো এতদিনে। ভালই হলো। মস্ত বড় একটা অভিশপ্ত সৌভাগ্য চূর্ণ হয়ে গেল, এই মাত্র। আবার এই বিরাট সহরের একটা কোণে, মলিন একটা গলির মুখে ছোট একটা বাসার ভিতরে ঢুকে অভাব উপোস আর দীনতার জীবন বরণ ক'রে নিতে হবে। মন্দ কি? বেশ আরাম করে একটা হাঁপ ছাড়া যাবে। নিজেকে আর এত ঘৃণা করবার ভয় থাকবে না।

জেনারেল ম্যানেজারের চিঠি পেয়ে ভয়ে মাথা হেঁট হয়নি, বরং ঘরের ভিতরে ঘুরে ঘুরে মাথাটা বেশ উঁচু করে ভাবতে থাকে অবন্তী। খবর শুনে বাবা আবার দুঃখে মুসড়ে পড়বেন, এবং আবার ভগবানের দয়াতে সন্দেহ করবেন। চারু হারু আর নরু স্কুল থেকে ফিরে এসে খবর শুনেই আতংকিত হবে। হোক, ওরা জানে না যে, এই সব রঙীন সৌভাগ্য অবন্তী সরকার নামে একটা মেয়ের কালো চোখের নিষ্ঠুর কৌতুকের সৃষ্টি। জানতে পারলে ওরাও বোধ হয় বলে ফেলবে যে, ভালোই হলো।

ঘরের দরজার পর্দার কাছে একটা ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। অবন্তী বলে—কে?

আমি টাইপিস্ট চারুবাবু।

ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে চারুবাবুকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে বসতে অনুরোধ করে অবন্তী। চারুবাবু বলেন—খবর শুনে খুবই দুঃখিত

হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি অবন্তী মা।

অবন্তী হাসে—দুঃখ করবেন না।

চারুবাবুর চোখ দুটো যেন রাগে কটমট করে।—দুঃখ করবো বৈকি। আমরা অফিসের সবাই ঠিক করেছি, কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে গিয়ে তোমার হয়ে সাক্ষী দেব। তুমি এখনই জেনারেল ম্যানেজারের বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন লিখে আমার কাছে দাও আমি যথাস্থানে সেই কমপ্লেন পাঠিয়ে দেব।

অবন্তী—কিসের কমপ্লেন?

চারুবাবু—ওসব প্রশ্ন করো না অবন্তী মা। আমরা সব খবর রাখি। ঐ অসভ্য বর্বর জেনারেল ম্যানেজার কেন তোমার চাকরিটাকে বাতিল করে দিলো, সে রহস্য আমরা জানি। ওকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

অবন্তী—আমি আর কমপ্লেন করবো না চারুবাবু। চাকরিটা যাওয়াতে আমি খুশিই হয়েছি।

চারুবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পরই হঠাৎ যেন প্রসন্ন হয়ে ওঠেন।—তা একরকম ভালো। আত্মসম্মান বজায় রেখে সরে যাওয়াই ভালো।

অবন্তী বলে—চা আনি?

চারুবাবু—না না, তুমি আর এই অসময়ে আমাকে চা খাওয়াবার চেষ্টা করো না। তা ছাড়া, এই তো আমার সেই ভাগ্নে বাবাজীর বাড়ি থেকে চা খেয়ে আসছি। ভাগ্নে-বউটি সত্যিই বড় সুন্দর। যেমন ভাল স্বভাব, তেমনি ভাল দেখতে।

অবন্তীর কালো চোখের তারা তেমনই স্নিগ্ধ হয়ে থাকে, একটুও চমকে ওঠে না।—আপনার ভাগ্নের বিয়ে হলো কবে?

চারুবাবু—এই তো মাস দেড়েক হলো। কেন? তুমি খবর পাওনি?

অবন্তী—না।

চারুবাবু—ভাগ্নে-বউ যে বললে, তোমার নাম করেই বললে, তুমি

তার বন্ধু।

অবন্তী—ঠিকই বলেছে। বোধ হয় লজ্জা ক'রে, কিংবা রাগ ক'রে, না হয় ভুল ক'রে চিঠি দিতে ভুলে গিয়েছে।

চারুবাবু—অদ্ভুত ভুল! যাক, যদি তোমার কোন দরকার থাকে তবে বুড়োকে একটা খবর দিও অবন্তী।

অবন্তী—একটা দরকারের কথা এখনই বলতে পারি।

চারুবাবু—বল।

অবন্তী—আমার জন্য একটা বাসা খুঁজে দিন। ভাড়া পঁচিশ ত্রিশের বেশি হলে চলবে না।

সে কি? আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন চারুবাবু। তারপরেই যেন একটু কুণ্ঠার সঙ্গে আর চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করেন।—তোমাকে একটু আধটু সাহায্য করতে পারে, এমন কোন আত্মীয় কি নেই?

অবন্তী—না চারুবাবু।

চারুবাবু—তা হলে চাকরিটা যাওয়াতে তুমি তো খুবই অসুবিধেয় পড়লে। বড় দুঃখের ব্যাপার হলো। তোমার অবস্থা এতটা অসহায় বলে আমি ভাবতেই পারিনি।···যাক, দেখি কি করতে পারি।

উনত্রিশ

এক অহংকেরে মেয়ের কথায় ওঠেন বসেন, এই অভিযোগ আত্মীয়দের কথায় আলোচনায় ও মন্তব্যে বহুবার শুনতে পেয়েও কোনদিন অখুশি হননি যে নিবারণবাবু, তাঁরই মন যেন এইবার একটা অখুশির প্রকোপে রুক্ষ হয়ে উঠেছে। বেলেঘাটার বসাক বাগান লেনের দুটি ছোট কুঠুরির চেহারার দিকে তাকালে নিবারণবাবুর চোখের দৃষ্টিটা যেন কুঁচকে যায়, এবং একটা বোবা বিরক্তি ভ্রূকুটি হয়ে ফুটে ওঠে। এ কি হলো? এত ভাল চাকরিটা হারিয়ে অবন্তী এ কোন্ ভয়ানক একটা জগতের গলির ভিতর এসে

ঠাঁই নিল। চারু হারু নরু আর গ্রামোফোন বাজায় না, ক্যারম খেলে না। কারণ গ্রামোফোন নেই, ক্যারম বোর্ড নেই। রেডিও সেট বেচে দিতে হয়েছে। পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটের সেই রঙীন জীবনের শোভাকে যেন ধূলো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে অবন্তী সবাইকে একটা বনবাসের ক্লেশ ও দুঃখের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছে।

প্রশ্ন করতে গিয়ে নিবারণবাবুর গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।—এমন ভাল চাকরিটা ছেড়ে দিলি কেন অবন্তী ?

ছাড়িয়ে দিলে।

কেন ছাড়িয়ে দিলে ?

আমাকে পছন্দ করলো না।

কেন ?

বোধহয় আমার অহংকারের জন্য।

অমন অহংকার কি না থাকলেই নয় ? ছিঃ, তোর লজ্জিত হওয়া উচিত অবন্তী।

অবন্তী শুধু নীরবে তাকিয়ে থাকে, নিবারণবাবুর আক্ষেপের ভাষা চুপ ক'রে সহ্য করে। এবং আশ্চর্য হয়। মেয়ের অহংকারের জেদ দেখে যে মানুষ জীবনের অনেক বছর খুশি হয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, সেই মানুষেরই কাছে আজ মেয়ের অহংকার অসহ্য হয়ে উঠেছে!

ভগবান কি আছেন ? বিশ্বাস করতে তো আর ইচ্ছে হয় না। নইলে···। নিজের মনেই বিড়বিড় করেন নিবারণবাবু, এবং পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট শরীরটাকে টান ক'রে উঠে বসতে চেষ্টা করেন। উঠে বসেন, এবং লাঠি ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে কুঠুরির জানালার কাছে এসে দেখতে থাকেন, ছোট একটা ছাতা আর একটা ঝোলা হাতে নিয়ে কোন্ এক মেয়েস্কুলে পড়াতে চলে গেল অবন্তী। পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে পায় অবন্তী। তিনশো ষাট টাকা মাইনের স্বর্গ থেকে তাড়া খেয়ে পঁয়ষট্টি টাকা মাইনের রসাতলে নেমে গিয়েছে তাঁর ঐ অহংকেরে মেয়ে।

ঐ পঁয়ষট্টি টাকা মাইনের চাকরিটা পেতেও কি কম ঝঞ্ঝাট সইতে হয়েছে। ভাগ্য ভাল, চারুবাবু নামে সেই টাইপিস্ট ভদ্রলোক অবন্তীকে বেশ স্নেহ করেন। তিনিই অনেক চেষ্টা ক'রে খোঁজ নিয়ে এসেছিলেন, এবং অনেক মানুষকে ধরাধরি ক'রে ও তোষামোদ করে অবন্তীকে চাকরিটা পাইয়ে দিতে সাহায্য করেছেন।

অবন্তীর ভাগ্যটার উপর রাগ করতে গিয়ে অবন্তীরই উপর রাগ হয়, এবং মাঝে মাঝে নিবারণবাবু তাঁর এই নিষ্ঠুর রাগটার জন্য নিজেই লজ্জিত হন। হঠাৎ চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে। না, মেয়েটার উপর রাগ করা উচিত নয়। মেয়েটা নিজেই বা কি কম শাস্তি পাচ্ছে? ওরই শাস্তি যে সব চেয়ে বেশি। মেয়েস্কুলের চাকরি ছাড়া সন্ধ্যা-বেলা আরও দু'জায়গায় দুটি ছাত্রী পড়াবার কাজ নিয়েছে। পনর পনর, মোট ত্রিশ টাকা আরও পাওয়া যায়; এবং এই ত্রিশটা টাকা পাওয়ার জন্য মেয়েটাকে যে খাটুনি খাটতে হচ্ছে, তার ফল ফলে গিয়েছে। চারু হারু ও নরুর স্কুলের মাইনেটা অবশ্য ঐ ত্রিশ টাকার জোরেই কুলিয়ে যায়, কিন্তু অবন্তীর চেহারাটা যে শুকিয়ে ঝিরঝিরে হয়ে গেল।

টাইপিস্ট চারুবাবু আসেন মাঝে মাঝে। তাঁর কথার মধ্যে একটা উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে যেন চমকে ওঠে। এবং সেই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। বুঝতে পারেন নিবারণবাবু, অবন্তীর জীবনের ভালর জন্য খুব বেশি চিন্তা করেন চারুবাবু।

আক্ষেপ করেন চারুবাবু।—অবন্তী যদি ইচ্ছে করে, তবে এরকম কষ্টের জীবন সহ্য করবার দরকার আর হবে না নিবারণবাবু।

বুঝলাম না চারুবাবু।

এমন ভাল ছেলে কি নেই যে অবন্তীর মত মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে?

আপনি কি অনুপমের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, অনুপম নামে একটি যুবকের মনের ইচ্ছার আভাস নিবারণবাবু জানতে পেরেছেন। যে রিফিউজি মেয়ে-স্কুলে কাজ করে অবন্তী, সেই স্কুলেরই কমিটির মেম্বার অনুপম এই বসাকবাগান লেনের কুঠুরির মানুষগুলির জীবনের দশা নিজের চোখে দেখে গিয়েছে। অনুপমের অনেক খবর জানেন চারুবাবু। চারুবাবুর কাছেই জানতে পেরেছেন নিবারণবাবু, খুবই সদাশয় সৎ প্রকৃতির ছেলে ঐ অনুপম। টাকা পয়সা আছে অনুপমের, ওকালতির পশারও ভাল, এবং বেলেঘাটার বড় রাস্তার পাশে অনুপমের বাড়িটার চেহারাও সুন্দর ও সৌখীন।

যেদিন প্রথম এসেছিল অনুপম, সেদিন অবন্তী হেসে হেসে শান্ত ভাষায় অনুপমকে একটা অনুরোধও শুনিয়ে দিয়েছিল।—এরকম জায়গায় আপনার মত মানুষের আসা উচিত নয় অনুপমবাবু।

কিন্তু অনুপম কোন উত্তর না দিয়ে অবন্তীরই মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল, এবং তারপরেই হেসে ফেলেছিল—আপনি রাগ করলেও আমি আসবো।

কেন ?

সত্যি কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না।

বলুন।

আপনাদের মত মানুষের পক্ষে এত কষ্ট সহ্য করা উচিত নয়।

উচিত নয় ঠিকই, কিন্তু···।

কোন কিন্তু নেই। আমি সাহায্য করবো, এবং সে সাহায্য আপনাকে নিতে হবে।

না। মাপ করবেন।

অবন্তীর কথার মধ্যে রাগের উত্তাপ না থাকুক, খুবই স্পষ্ট ও কঠিন একটা আপত্তির সুর অবশ্যই ছিল। কিন্তু দেখা গেল যে, অনুপম সে আপত্তি গ্রাহ্য করলো না।

তার পর, শুধু একদিন দুদিন নয়, এই সাত মাসের মধ্যে অনেকবার এসেছে অনুপম। এবং অবন্তীর সঙ্গে সামান্য দু'চারটে কথায়

আলাপ শেষ হয়ে গেলেও প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরে এই কুঠুরির নিভৃতে বসে, হয় নিবারণবাবুর সঙ্গে, নয় চারু হারু আর নরুর সঙ্গে গল্প করেছে অনুপম।

এরই মধ্যে একদিন একটা কাণ্ড করেছিল অনুপম।

অভাবের সংসার; নিবারণবাবু অনেক চিন্তা করে শেষে ঠিক করলেন, তিনি নিজেই ঘরে বসে ছাত্র পড়াবেন। তাতে যা হয় তাই ভাল। দশ হোক, কুড়ি হোক, সামান্য কয়েকটা টাকা পেলেও যে অনেক কাজ হবে। মেয়েটা শুধু একাই খেটে খেটে শুকিয়ে যাবে কেন?

চারুবাবু চেষ্টা করে দুজন ছাত্র জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা ছাত্র দুজন এসে নিবারণবাবুর কাছ থেকে পড়া শিখে যাবে। দশ দশ কুড়ি টাকা প্রতি মাসে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাদ সাধলো অনুপম। অনুপম এসে নিবারণবাবুকে ছাত্র পড়াতে দেখে যেন রেগে অস্থির হয়ে গেল।—ছি, ছি, এ কি কাণ্ড করছেন আপনি? কি ভেবেছেন? আমি থাকতে আপনাকে এই বয়সে এরকম যাচ্ছেতাই কাণ্ড করতে দেব না। তাতে যাই মনে করুন আপনি।

অনুপমের কঠোর বাধায় ছাত্র পড়িয়ে কুড়ি টাকা রোজগারের সুযোগ পেলেন না নিবারণবাবু। এবং সেদিন নিবারণবাবুর হাতে অনুপম জোর করে একশো টাকা গছিয়ে দিয়ে চলে যাবার পর আবার একদিন এসে অনুরোধ করে!—আমাকে পর মনে করবেন না।

নিবারণবাবু—না, তা কেন মনে করবো? পরই তো আপনজন হয়ে যায়।

অনুপম—আমার কাছ থেকে টাকা নিতে কোনদিন আপনি আপত্তি করবেন না। আপত্তি করলে আমি খুবই দুঃখিত হব।

আর আপত্তি করেননি নিবারণ বাবু। এবং একদিন একটু বেশি উৎসাহিত হয়ে চেঁচিয়েও উঠেছিলেন—শুনেছিস অবন্তী?

কি ?

অনুপম সত্যিই আমাদের একেবারে পর নয়।

তার মানে কি ?

তার মানে, আজই অনুপমের সঙ্গে আলাপে আলাপে জানতে পারলাম, তোর মেজ পিসির এক জা-এর ছেলে হলো অনুপম।

অবন্তী হাসে—কিন্তু তাই বলে অনুপমবাবু যখন-তখন টাকা দিতে চাইলে তুমি নিয়ে বসো না।

অপ্রসন্নভাবে তাকিয়ে থাকেন নিবারণবাবু—কি বলতে চাইছিস ? অনুপমের টাকা নিয়ে অন্যায় করছি আমি ?

অবন্তী—হ্যাঁ।

কেন ?

ভদ্রলোককে মিছিমিছি ঠকানো হচ্ছে ?

একথারই বা মানে কি ! অনুপমের মত ছেলে কি…।

তিনি খুব ভাল ছেলে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর টাকা নেওয়া আমাদের উচিত নয়।

অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের গম্ভীর দৃষ্টিটাকে একটু কোমল ক'রে নিয়ে নিবারণবাবু বলেন—খুব বেশি অহংকার ভাল নয় অবন্তী। এমন অহংকারের কোন অর্থ হয় না।

নীরব হয়ে শুধু শুনতে থাকে অবন্তী। কোন উত্তর দেয় না।

নিবারণবাবু বলেন—বেশ, তা'হলে অনুপমকে স্পষ্ট ক'রে বলে দেব যে, আর টাকা নেওয়া আমাদের উচিত নয়।

ত্রিশ

অবন্তী তখনও বাড়ি ফেরেনি। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। স্কুলের ছুটির পর দু'জায়গায় ছাত্রী পড়িয়ে ফিরতে রোজই সন্ধ্যা পার হয়ে যায়, এবং সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামলে ফিরতে বেশ একটু রাতও হয়।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তবু বসাক বাগান লেনের অতি ছোট একটা বাড়ির কুঠুরির ভিতরে বেতের মোড়ার উপর চুপ ক'রে বসে থাকে অনুপম। অনুপমের হাতে একটা ফুলের তোড়া।

একটা কথা খুবই স্পষ্ট ক'রে বলেছেন নিবারণবাবু, এবং চমকে উঠে নিবারণবাবুর সঙ্গে সেই মুহূর্তে আলাপ বন্ধ ক'রে দিয়েছে অনুপম। নিবারণবাবুর কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি অনুপম। অসম্ভব! এই আপত্তি নিতান্তই একটা অভিমান; যতই অহংকার থাকুক অবন্তীর, অনুপমের কাছে অকৃতজ্ঞ হবার মত মেয়ে নয় অবন্তী। একদিন দু'দিন নয়, সাত-আট মাস ধরে এই অভাবের সংসারটাকে উপকারে উপকারে ভরে দিয়েছে অনুপম। অবন্তী কি জানে না, নিবারণবাবুর শরীরটা আজ এতটা সুস্থ হয়ে উঠলো কেমন ক'রে? কার সাহায্যে? অবন্তীরই বাপ ও ভাইদের জীবনে আনন্দ এনে দিয়েছে যে, তাকেই তুচ্ছ করবে অবন্তী? হতে পারে না।

অবন্তী জানে না, অবন্তীকে মনে-প্রাণে ভালবেসেছে অনুপম। কোনদিন এই ভালবাসার কথা অবন্তীর কাছে বলেনি অনুপম। বলার দরকার কি? অবন্তীর ঐ সুন্দর দুটি চোখ নিশ্চয়ই বোকা নয়? বুঝতে পারেনি কি অবন্তী? ঘরে ঢোকে অবন্তী, এবং অনুপমকে দেখেই চমকে ওঠে। এই ঘরের ভিতরে কোনদিন অনুপম আসেনি। কিন্তু আজ যেন একটা শুভ প্রতীক্ষার ব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্য ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বসে আছে অনুপম।

অবন্তী বলে—বাবা কি বাড়িতে নেই?

অনুপম হাসে—আছেন। কিন্তু আমি আপনারই অপেক্ষায় বসে আছি। আপনারই কাছে কয়েকটা কথা বলবার আছে।

বলুন।

আপনার বাবার কাছ থেকে একটা কথা শুনে দুঃখিত হলাম। আমার কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া নাকি আপনাদের উচিত নয়।

অবন্তী হাসে—তার মানে, আমাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা

আপনার উচিত নয়।

কেন অবন্তী?

চমকে ওঠে অবন্তী। এবং অনুপমের সেই শান্ত আশ্বস্ত ও মুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে হাসতে থাকে।—আমি ঠিক এই ভয়ই করেছিলাম অনুপমবাবু।

ভয়? তোমাকে আমি ভালবাসি, এর জন্য তুমি ভয় পেলে অবন্তী?

আপনি ভুল করেছেন অনুপমবাবু!

কিসের ভুল?

আপনার মনে সন্দেহ থাকা উচিত ছিল যে, আমি আপনাকে ভালবাসি না।

তুমি ভালবাস না?

অবন্তী আবার হাসে—মাপ করবেন অনুপমবাবু। আপনার সন্দেহ করা উচিত ছিল যে, আমি হয়তো অন্য কাউকে ভালবাসি।

অনুপম—কিন্তু সে কি আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে তোমাকে?

অবন্তী—তাই তো মনে হয়।

অনুপম—সে কি আমার মত এরকম প্রাণ ঢেলে দিয়ে তোমাদের উপকার করতে পেরেছে?

অবন্তীর চোখে এক টুকরো বিদ্যুতের ঝিলিক চমকে ওঠে। সে নিজেকে প্রায় প্রাণে মেরে ফেলে আমাদের উপকার করেছে।

স্তব্ধ হয়ে যায় অনুপমের চোখের সব চঞ্চলতা। অপলক চোখে ঘরের আলোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অনুপম। তার পরেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—বৃষ্টি থেমে গিয়েছে বোধ হয়।

অবন্তী—হ্যাঁ।

অনুপম—নরুকে একবার ডাকুন তো।

অবন্তী—কেন?

অনুপম—ফুলের তোড়াটা নরুকে দিয়ে যাই।

অবন্তীর ডাক শুনে নরু আসে। নরুর হাতে ফুলের তোড়া তুলে

দিয়েই দরজার দিকে এগিয়ে যায় অনুপম।

লাঠি ভর দিয়ে পাশের ঘর থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে যখন এই ঘরের ভিতরে ঢোকেন নিবারণবাবু, তখন অনুপম চলে গিয়েছে। অবন্তীর ক্লান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন।—এরকম অদ্ভুত কথা তো আগে তোকে কখনও বলতে শুনিনি।

অবন্তী—কি ?

নিবারণবাবু—অনুপমকে এইমাত্র যে কথাটা বললি। কথাটা কানে এল তাই আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমার ধারণা ছিল না যে, নিখিল কখনও আমাদের উপকার করেছে।

চমকে উঠলেও শুধু চুপ ক'রে শুনতে থাকে অবন্তী। নিবারণবাবু নিজের মনের বিস্ময়ের আবেগে বলতে থাকেন—কে জানে, কোন-দিনও তো বুঝতে পারিনি, নিখিল আমাদের এত উপকার করেছে। বেচারা নিজেকে প্রাণে মেরে···।

চেঁচিয়ে ওঠে অবন্তী—ভুল বুঝেছ বাবা। নিখিল নয়।

নিবারণবাবু ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন—তবে কে ?

অবন্তী—তাকে তুমি দেখনি। তাকে তুমি চেন না।

নিবারণবাবু অপ্রস্তুতের মত কুণ্ঠিত স্বরে বলেন—সে কোথায় ?

এই কলকাতাতেই আছে।

আসে না কেন ?

আমাদের ঠিকানা জানে না।

ঠিকানা জানিয়ে দে।

না।

কেন ?

তাকে আর বিরক্ত করতে চাই না।

তার মানে ?

তার মানে, সে নিজেই কষ্টে আছে।

তোর কষ্টের চেয়ে বেশি কষ্ট তো নয়।

বেশি না হোক, কম নয়।

ছেলেটি খুবই গরীব নাকি ?

ইচ্ছে ক'রে গরীব হয়েছে।

কিসের জন্য।

আমাদেরই জন্য।

কি বললি ?

আমারই জন্য। ওকে ঠকিয়ে ওর চাকরিটা আমিই নিয়েছিলাম।

মিশন রো'র অফিসের চাকরিটা ?

হ্যাঁ।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন নিবারণবাবু। বসাক বাগানের সরু গলির ভিতর থেকে ঘুঁটে পোড়া ধোঁয়া এসে সারা ঘরের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। মাথা তুলে ঘরের চালাটার দিকে একবার তাকান নিবারণবাবু। তখনো চালার একটা ফুটো দিয়ে টুপ টাপ ক'রে জলের ফোঁটা ঝরছে। আড়ষ্ট শরীরটাকে টান ক'রে নিয়ে একটা হাঁপ ছাড়েন নিবারণবাবু। ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ একটা হাসির রেখা তাঁর বিবর্ণ মুখের উপর ছটফট ক'রে ওঠে। নিবারণবাবু বলেন—ভগবান আছেন মনে হচ্ছে।

একত্রিশ

শীত ফুরিয়েছে কবেই, গ্রীষ্মও ফুরিয়ে গেল। কালো কালো আষাঢ়ে মেঘের ছায়া মাঝে মাঝে টালিগঞ্জের গলির তপ্ত ধূলোর উপরেও এসে লুটিয়ে পড়ে।

জটিল গণিতের বই বন্ধ ক'রে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে আষাঢ়ে মেঘের কালো-কালো শোভার দিকে শেখর মিত্রকেও তাকাতে হয়। অবন্তী সরকার নামে একটি নারীর মুখটাও বেশ ভাল ক'রে এবং বার বার মনে পড়ে।

ডাক পিয়ন এসেছিল বোধহয়। মধু ছুটে এসে একটা চিঠি শেখর মিত্রের হাতের কাছে ফেলে দিয়ে চলে যায়। দেখে বুঝতে পারে

না শেখর, এই চিঠি কার চিঠি হতে পারে। এবং চিঠি খুলেই বুঝতে পারে, অনসূয়ার চিঠি।

কিন্তু চিঠিটা অনসূয়ার কোন সুখবর নয়। অবন্তী সরকারেরই খবর। অনসূয়ার চিঠির ভাষাটাও যেন একটা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অনুযোগের ঝড়।—এ কি কাণ্ড করছেন আপনি? অবন্তীর জীবনের জন্য কি আপনার কোন দায়িত্ব নেই? মেয়েটা যে না খেয়ে মরতে বসেছে...।

চমকে ওঠে শেখর। শেখরের চোখে যেন জ্বালাভরা ধোঁয়ার ছোঁয়া এসে লেগেছে। চিঠির লেখাগুলিকেই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কতগুলি প্রলাপ বলে মনে হয়। চোখ মোছে শেখর।

অবন্তী এখন থাকে বেলেঘাটার একটা গলিতে। এগার নম্বর বসাক বাগান লেন। একটা রিফিউজি মেয়ে-স্কুলে ষাট টাকা মাইনের চাকরি করছে অবন্তী। ডাক্তার বলেছে, অবন্তীর বুকের ব্যথাটা হলো প্লুরিসির ব্যথা।

অনসূয়ার লেখা চিঠিটাকে দুমড়ে বুকের কাছে চেপে ধরে শেখর। মনে হয়, বুকের পাঁজরটা কাঁপতে কাঁপতে এখনই ছিঁড়ে যাবে। এ কি করলো অবন্তী? কাকে শাস্তি দিচ্ছে ঐ ভয়ানক মেয়ে?

বিধু হঠাৎ এসে ডাক দেয়।—এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বড়দা!

ঘরের বাইরে এসে এক অপরিচিত প্রবীণ ভদ্রলোককে দেখে প্রশ্ন করবার আগে সেই ভদ্রলোকই বলে ওঠেন—আমি আমার ভাগ্নে-বউ অনসূয়ার কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিয়ে বিশেষ একটা অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

শেখর—বলুন।

ভদ্রলোক—আমি হলাম টাইপিস্ট চারুবাবু, অবন্তী যে অফিসে কাজ করতো, আমি সেই অফিসেই কাজ করি। কথাটা হলো...।

চারুবাবু একটু বিব্রত ভাবে এবং একটু বিচলিত স্বরে বলেন—অবন্তী আমাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছিল যে, তাকে সাহায্য করতে

পারে এমন কোন আত্মীয় তার নেই। কিন্তু আমার ভাগ্নে-বউ-এর কাছে শুনলাম যে, আপনি অবন্তীর কাছে আত্মীয়ের চেয়েও আপন জন।

প্রতিবাদ করে না শেখর। আজ যেন সারা পৃথিবীটাই চেঁচিয়ে আর রাগ ক'রে সাক্ষী দিচ্ছে যে, শেখর মিত্রই হলো অবন্তী সরকার নামে এক নারীর একমাত্র আপনজন।

চারুবাবু বলেন—আমি শুধু এই কথাই আপনাকে বলতে এসেছি যে, আপনি যদি অবন্তীর উপর রাগ ক'রে থাকেন, তবে সেটা মস্ত ভুল করা হবে শেখরবাবু। আপনি সব খবর জানেন না, আমিও আপনাকে বলবো না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের অবন্তীর মত এমন খাঁটি মনের মেয়ে আমি আর দেখিনি।

চারুবাবুর চোখ দুটো ছল ছল করছে বলে মনে হয়। শেখর বলে—আপনার ইচ্ছা এই তো, আমি যেন অবন্তীর সঙ্গে একবার দেখা করি?

চারুবাবু—তাই, তাই, তার বেশি কিছু বলতে চাই না।

শেখর—তাই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তবু চারুবাবু আরও একটা কথা বলতে চেষ্টা করেন, এবং চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর দু'চোখে যেন একটা আবেদন নিবিড় হয়ে ওঠে। বোধ হয় আরও নিশ্চিন্ত হতে চান চারুবাবু, এবং শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলেন—তোমরা দুজনে সুখী হয়েছ জানতে পেলেই আমরা সুখী হব। বলতে বলতে এবং আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যান বুড়ো টাইপিস্ট চারুবাবু।

বত্রিশ

এগার নম্বর বসাক বাগান লেন, বেলেঘাটা। বাড়িটা খুঁজে পেতে অনেক হয়রান হতে হয়েছে। সারি সারি অনেকগুলি টিনের শেড, তার মধ্যে মরচে পড়া যত টিনের পিপে পাহাড়ের মত স্তূপ ক'রে সাজানো। এখানেও নয়। এর পরে একটা গরু-মহিষের খাটাল। তারপরে গলি। সেই গলির মধ্যে যেখানে মস্ত বড় একটা ডাস্টবিন, তারই পাশে এগার নম্বর নিকেতন।

কপালের ঘাম মুছে শেখর দরজার দিকে তাকায়। এখানেই থাকে অবন্তী সরকার। শেখরের মনের ভিতর একটা ক্লান্ত যন্ত্রণা যেন ফিস ফিস ক'রে বলে, বোধ হয় মরেই গিয়েছে তোমার অবন্তী সরকার।

মরিয়া হয়ে ডাকাতের মত দুরন্ত আগ্রহ নিয়ে দরজার কড়া নাড়ে শেখর। এবং সেই মুহূর্তে দরজা খুলে দিয়ে ভিতর থেকে যে মেয়ের দুটি চোখ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে, সে হলো অবন্তী সরকার।

সত্যিই অবন্তী সরকার। দেখে বিশ্বাস করতে পারা যায়। কিন্তু শেখরের মনে হয়, অবন্তী সরকারের জীবন্ত চেহারার ঐ রূপ না দেখে ওর মরা চেহারার রূপ দেখলেই বোধ হয় ভাল ছিল। শেখরের হৃৎপিণ্ডটা তাহলে এমন করে আগুনে পোড়া সাপের মত যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে উঠতো না।

অবন্তী সরকার দাঁড়িয়ে আছে। সেই কালো চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তিটা যেন জ্যোৎস্না হয়ে গলে গিয়েছে। শীর্ণ ও শুকনো একটা মুখ। ঠোঁটের লালচে শোভা যদিও মরে গিয়েছে, কিন্তু অবন্তীর মুখের হাসি মরে যায় নি। শেখরের দিকে তাকিয়ে অবন্তীর রোগা মুখের সব বিষাদ ছাপিয়ে বর্ষায় ধোয়া চাঁদের আলোর মত হাসি ফুটে উঠেছে।

এক হাতে একটা ছাতা। আর এক হাতে একটা ব্যাগ, তার মধ্যে

কতগুলি বই আর খাতা। কালোপাড় একটা প্লেন শাড়ি দিয়ে মোড়া একটা সাদা ও রোগা খেলনা-মূর্তির মত স্থির হয়ে রয়েছে অবন্তীর শরীরটা।

শেখর বলে—কোথাও যাবার জন্য তৈরী হয়েছ বোধহয় ?

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—স্কুলে যাচ্ছ ?

অবন্তী—হ্যাঁ।

শেখর—প্লুরিসির ব্যথাটা নেই ?

অবন্তী হাসে—আছে, কিন্তু ভুলেই গিয়েছি।

শেখর—আমাকে শাস্তি দেবার জন্যেই কি এই কাণ্ড করলে ?

অবন্তী—কিসের কাণ্ড ?

শেখর—এই, দুর্দশা।

অবন্তী—কা'র ?

শেখর—তোমার।

অবন্তী—না. দুর্দশা নয়।

শেখরের চোখের জ্বালা এইবার যেন আরও মরিয়া হয়ে ছটফট করে।—তবে ?

মাথা হেঁট করে না অবন্তী। মুখ তুলে সোজা শেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবন্তীর দুই কালো চোখে যেন বিচিত্র এক গর্বের ছায়া নিবিড় হয়ে রয়েছে।

শেখর—আমার কথার উত্তর দাও অবন্তী।

অবন্তীর চোখের পাতাও হঠাৎ ভিজে গিয়ে কালো চোখের ছায়া-ছায়া রহস্যকে আরও স্নিগ্ধ ক'রে তোলে। অবন্তী বলে—খুব খুশি মনে নিজের এই দশা করেছি। নইলে হেঁট মাথা তুলে তোমার মুখের দিকে তাকাবার জোরই যে পাচ্ছিলাম না।

ঠিকই বলেছে অবন্তী। হেঁট মাথা নয়। অবন্তী যেন আজ তার জীবনের এক ভয়ানক কঠিন গৌরবের জোরে জয় করা ভালবাসার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। শেখরের প্রাণের সব তৃষ্ণাকে

তৃপ্ত হবার জন্য আহ্বান করছে অবন্তী সরকারের ঐ সাদা ও শুকনো দুটি ঠোঁট।

শেখর বলে—স্কুলে যেতে হবে না।

অবন্তীকে আর কোন প্রশ্ন করবারই সুযোগ দেয় না শেখর। শেখরের দুই হাতের ব্যাকুল আগ্রহের মধ্যে বন্দী হয়ে যায় অবন্তীর রোগা চেহারা। ইচ্ছে ক'রে যেন বুকভরা অগাধ দুঃসাহসের জোরে মুখটাকে শেখরের পিপাসার কাছে এগিয়ে দেয় অবন্তী। চোখের পাতা আরও ভিজে গেলেও চোখ বন্ধ করে না অবন্তী।

শেখর বলে—এই তো চাই। এইভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাক অবন্তী। সরে যেও না।

অবন্তী—সরে যাব না। কিন্তু একটিবার অন্তত মাথা নামাবার সুযোগ দাও।

শেখর—সুযোগ পরে পাবে।

পরে মানে অনেকদিন পরে নয়, আর সামান্য কিছুক্ষণ পরেই মাথা নামাবার সুযোগ পায় অবন্তী।

শেখর বলে—তোমার বুকের ব্যথাটাকে যে শিগগির সারিয়ে তুলতে হবে অবন্তী।

অবন্তী হাসে—মনে হচ্ছে, সেরেই গিয়েছে।